Education is the manifestation of the perfection already in man
Religion is the manifestation of the Divinity already in man

Vivekananda

ISBN 978-81-934762-5-3

মূল্য ৫০ টাকা

চরিত্র গঠনে বড়দের ভূমিকা

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ

চরিত্র গঠনে বড়দের ভূমিকা

অসতো মা সদ্গময়

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ

চরিত্র গঠনে বড়দের ভূমিকা

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
বেলুড় মঠ, হাওড়া

প্রকাশক ঃ সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২

ISBN ঃ 978-81-934762-5-3

প্রকাশ ঃ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি
৮ই জানুয়ারী, ২০১৮

মূল্য ঃ ৫০ টাকা

মুদ্রক ঃ সৌমেন ট্রেডার্স সিণ্ডিকেট
৯/৩, কে.পি. কুমার ষ্ট্রীট
বালি, হাওড়া
দূরভাষ ঃ ২৬৫৪-৩৫৩৬

প্রকাশকের নিবেদন

চরিত্র গঠনে মনের প্রভাব অপরিসীম।

বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে ও বিদেশে বহু দার্শনিক, মনোবিজ্ঞানী, সমাজতাত্ত্বিক ও চিন্তাবিদ মানব মনকে নিয়ে বিভিন্ন চিন্তাভাবনা করছেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিরাও মানব মনকে নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন এবং তাঁরা মনকে নিয়ন্ত্রণ করার সঠিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। মহর্ষিপতঞ্জলি প্রণীত যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যে আছে 'চিত্তনদী নাম উভয়তো বাহিনী, বহতি কল্যাণায়, বহতি পাপায় চ।' অর্থাৎ চিত্ত নামক নদীর দুটি প্রবাহ ধারা রয়েছে — একটি পাপের ধারা অপরটি পুণ্যের বা কল্যাণের ধারা। অর্থাৎ মানব মনের দুটি ভাব। একটি শুভ ও অন্যটি অশুভ। শুভভাব বা শুভ সংস্কার মানুষকে ভালোর দিকে অর্থাৎ সৎ কর্মে প্রবৃত্ত করে, অন্যদিকে অশুভভাব বা অশুভ সংস্কার মানুষকে অসৎ কর্মে নিয়োজিত করে। তাই চরিত্র গঠনের কাজে মনকে চালিত করাই হল প্রধান কাজ।

প্রকৃত শিক্ষার আদর্শ কী হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছেন— 'মনরূপ যন্ত্রটিকে সুষ্ঠুতর করে তোলা এবং তাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করা— এই হল শিক্ষার আদর্শ।' মনকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রক্রিয়াটি শৈশব কাল থেকেই শুরু করতে হয়। শিশুমন বিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা থাকে বাবা-মায়ের। পরবর্তীকালে শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী—সকলের দ্বারাই শিশুমন বিকশিত হতে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, নরম মাটিতেই বিভিন্ন ধরণের মূর্তি গড়া যায়। পোড়া মাটিতে নতুন গড়ন হয় না। ঠিক সেই রকম শিশুমনকে সঠিক সময়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে তার মানসিক গঠনটিও সুন্দর হয়ে ওঠে। সৎ শিক্ষা, দেশীয় ঐতিহ্য ও আদর্শ সম্পর্কে সঠিক ধারণা - প্রতিটি

মানুষেরই থাকা উচিত। অভিভাবক ও শিক্ষকদের তাই প্রথম থেকেই এ সম্বন্ধে সচেতন থাকা জরুরী এবং সেইমত শিশুমনকে ধীরে ধীরে বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্রে, চরিত্র গঠনের কাজে সহায়তা করা দরকার। স্বামীজী বলতেন ছাত্র-ছাত্রীদের শুধু পুঁথিগত বিদ্যাশিক্ষা দিলে হবে না; তার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধর্ম, সমাজবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন এবং দেশীয় ঐতিহ্য ও আদর্শ সম্পর্কেও শিক্ষা দিতে হবে। তবেই ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সম্পূর্ণতা লাভ করবে এবং সে সর্বাঙ্গ সুন্দর মানুষ হয়ে উঠবে।

চরিত্র গঠনে বাবা-মা ও শিক্ষকের ভূমিকা — এই বিষয়ে ইংরেজীতে অনেক বই লেখা হলেও বাংলা ভাষায় এতদিন পর্যন্ত সে রকম কোন ভালো বই লেখা হয়নি। বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ স্বামীজীর সার্ধশতবর্ষে ইংরাজীতে 'Parents and Teachers in Value education' নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। বইটি সুধীজনের কাছে অত্যন্ত সমাদর লাভ করেছে। বর্তমান বইটি তারই বঙ্গানুবাদ। এই বঙ্গানুবাদের কাজে যারা সহায়তা করেছেন তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। যাদের জন্য এটি লেখা, সেই শিক্ষক ও অভিভাবকদের বইটি কাজে লাগলে বইটির প্রকাশ সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

স্বামী দিব্যানন্দ
সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
বেলুড় মঠ

অধ্যায় ১

মূল্যবোধ

একটি উন্নত আদর্শের ভিত্তিতে জীবনকে গড়ে তুলতে হলে, সেই আদর্শের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মূল্যবাধ সম্পর্কে সচেতনতা জরুরী। তাই সর্বাগ্রে আমরা মূল্যবোধ সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ের ধারণা স্পষ্ট করে নেব।

ক) মূল্যবোধের তাৎপর্য

খ) নৈতিক মূল্যবোধ অভ্যাস করার উদ্দেশ্য

গ) আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে ধারণা

[ক] মূল্যবোধের তাৎপর্য

শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত একটি গল্পের অবতারণা করে আমরা মূল্যবোধ বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করব। সুপরিচিত গল্পটি এইরকম ঃ একজন বাবু তার চাকরকে বললে, 'তুই এই হীরেটি বাজারে নিয়ে যা। আমায় বলবি, কে কি-রকম দর দেয়। আগে বেগুনওয়ালার কাছে নিয়ে যা।' চাকরটি প্রথমে বেগুনওয়ালার কাছে গেল। সে নেড়ে চেড়ে দেখে বললে—'ভাই, নয় সের বেগুন আমি দিতে পারি!' চাকরটি বললে, 'ভাই আর একটু ওঠ, না হয় দশ সের দাও।' সে বললে, 'আমি বাজার দরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি; এতে তোমার পোষায় তো দিয়ে যাও।' চাকর তখন হাসতে হাসতে হীরেটি ফিরিয়ে নিয়ে বাবুর কাছে বললে, 'মহাশয়, বেগুনওয়ালা নয় সের বেগুনের বেশি একটিও দেবে না। সে বললে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি।'

বাবু হেসে বললে, 'আচ্ছা এবার কাপড়ওয়ালার কাছে নিয়ে যা। ও বেগুন নিয়ে থাকে, ও আর কতদূর বুঝবে! কাপড়ওয়ালার পুঁজি একটু বেশি, — দেখি ও কি বলে।' চাকরটি কাপড়ওয়ালার কাছে বললে, 'ওহে এটি নেবে? কত দর দিতে পার?' কাপড়ওয়ালা বললে, 'হাঁ জিনিসটা

ভাল, এতে বেশ গয়না হতে পারে; — তা ভাই আমি নয়শো টাকা দিতে পারি।' চাকরটি বললে, 'ভাই আর-একটু ওঠ, তাহলে ছেড়ে দিয়ে যাই; না হয় হাজার টাকাই দাও।' কাপড়ওয়ালা বললে, 'ভাই, আর কিছু বলো না; আমি বাজার দরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি; নয়শো টাকার বেশি একটি টাকাও আমি দিতে পারব না।' চাকর ফিরিয়ে নিয়ে মনিবের কাছে হাসতে হাসতে ফিরে গেল আর বললে যে, কাপড়ওয়ালা বলেছে যে নশো টাকার বেশি একটি টাকাও সে দিতে পারবে না! আরও সে বলেছে, 'আমি বাজার দরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি।' তখন তার মনিব হাসতে হাসতে বললে, 'এইবার জহুরীর কাছে যাও—সে কি বলে দেখা যাক।' চাকরটি জহুরীর কাছে এল। জহুরী একটু দেখেই একবারে বললে, 'একলাখ টাকা দেব।'

গল্পের ব্যঞ্জনাটি সুস্পষ্ট—কোন মহামূল্যবান বস্তুর প্রকৃত গুরুত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা, স্বল্পজ্ঞতা অথবা সঠিক ধারণাই বস্তুটির মূল্যবোধ সম্পর্কে এত বিবিধ তারতম্যের সৃষ্টি করে। বাস্তবিক, আমাদের ব্যক্তিজীবনের মূল্যবোধ ঠিক এই রকম ভাবেই জড়িয়ে আছে আমাদের সামগ্রিক জীবন বোধের সাথে। একজন মানুষের নিজের সম্পর্কে ধারণা যখন সীমিততম (অর্থাৎ মানুষ যখন নিজেকে দেহ ভিন্ন কিছু ভাবতে পারে না), তখন ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিই যেন তার জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। এইরকম দৃষ্টিভঙ্গীজাত মূল্যবোধ সেই জিনিসটিকেই মূল্যবান ভাবে যেটি একটি স্থূল ভোগ্য সামগ্রী হবার উপযুক্ত। অপরদিকে, একজন চিন্তাশীল ব্যক্তির জীবনের আনন্দের উৎস সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান ইত্যাদির চর্চায়। এইরকম মানুষের মূল্যবোধের নিরিখে স্থূলভোগের গুরুত্ব অতি সামান্যই। আবার, মানুষ যখন তার অন্তর্নিহিত দেবত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়, তখন নিজের মধ্যে দেবত্বের অনুসন্ধানই হয়ে দাঁড়ায় তার কাছে সর্বাধিক মূল্যবান। বস্তুত, সর্বোচ্চ এই মূল্যবোধটির আবির্ভাবেই প্রকৃত মনুষ্যজীবনের সূচনা হয়।

১.১ ভারতীয় সংস্কৃতিতে মূল্যবোধ ঃ

মূল্যবোধ বিষয়টির একটি সামগ্রিক রূপ সুপ্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে 'পুরুষার্থ' নামক জীবনদর্শনে নিহিত রয়েছে। পুরুষার্থ চারটি হলো—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। আমরা এই পুরষার্থ চারটিকেই বিভিন্ন স্তরের মূল্যবোধ হিসেবে দেখতে পারি। এখানে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মূল্যবোধটি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় প্রথম মূল্যবোধটি দিয়ে। ধর্মের কঠোর অনুশাসন ছাড়া ধন-সম্পদ বা ইন্দ্রিয় বাসনার বাঁধনহীন ভোগ মানুষের চরম বিনাশ ডেকে আনে। আবার যখন কোন ব্যক্তির এই দুটি মূল্যবোধের (অর্থ এবং কাম) প্রতি তীব্র অনাসক্তি জন্মায়, তখন সে সর্বোচ্চ মূল্যবোধ 'মোক্ষ' উপলব্ধি করার জন্য সচেষ্ট হয়। বাস্তবিক মোক্ষ হল পরম আনন্দ, শান্তি এবং স্বস্বরূপের উপলব্ধি।

১.২ মূল্যবোধ ও সদ্‌গুণ ঃ

চরিত্র গঠনের মূল্যবোধ বলতে সাধারণতঃ নৈতিক আদর্শকেই বোঝায়। নৈতিক আদর্শ আমাদের অন্তরের সেই দৃঢ় বিশ্বাস যা উচিত এবং অনুচিতের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করে দেয়। বাস্তবিক, সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যবোধ এবং 'নীতিবোধ' কথা দুটি প্রায়শই সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

নৈতিক মূল্যবোধ কোন ব্যক্তির মনের গভীরতর স্তরের পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে তার জীবন ও আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। তাই, মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য এই ধরনের মূল্যবোধ খুব জরুরী। নৈতিক বলই মানুষকে প্রেম, স্বার্থত্যাগ ইত্যাদি গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। আবার, এই নৈতিক শক্তিই সমাজে সৌভ্রাতৃত্ব, অহিংসা ও ন্যায়ের মত মূল্যবোধের জন্ম দেয়।

খ নৈতিক মূল্যবোধের উদ্দেশ্য

১.৩ নৈতিক মূল্যবোধ আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভের উপায়

আমাদের মনে রাখা দরকার যে নৈতিক মূল্যবোধ উপায় মাত্র—উদ্দেশ্য নয়। এই মূল্যবোধগুলি অবশ্যই আমাদেরকে উৎকর্ষতা ও পূর্ণতার অনুসন্ধানে প্রেরণা দেয় কিন্তু এগুলি প্রকৃত পূর্ণত্বে আমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে না। আবার সামাজিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্যও শুধুমাত্র নৈতিক অনুশাসন মেনে চলাই পর্যাপ্ত নয়। বস্তুত, ধর্মই আমাদের জীবন তথা সমাজের মধ্যে প্রকৃত পরিবর্ত্তন ঘটায়। এখানে, ধর্ম অর্থে কিছু প্রথা ও আচার-আচরণ নয়—ধর্ম হল আধ্যাত্মিকতা।

প্রসঙ্গত, ডঃ রাধাকৃষ্ণণের নেতৃত্বে ১৯৪৮-৪৯ সালে গঠিত 'University Education Commission' এর ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বলিষ্ঠ সুপারিশটি অনুধাবনযোগ্য ঃ ''অনেকেই মনে করেন যে নৈতিকতা ধর্মের স্থান নিতে পারে। আমাদের বুঝতে হবে যে বিশ্বস্ততা, সাহস, শৃঙ্খলা ও আত্মত্যাগের মত মহান গুণগুলি ভাল কিংবা মন্দ দুটি পথেই যাওয়ার জন্য ব্যবহার করা যায়। এই গুণগুলি যেমন একজন সফল নাগরিক হওয়ার জন্য অপরিহার্য—ঠিক তেমনই একজন দুর্বৃত্ত হওয়ার জন্যও অপরিহার্য! উদ্দেশ্যের মহত্বই একজন মানুষকে মহৎ করে।

আমরা জীবনে কি পথ অনুসরণ করছি বা কিভাবে জীবন কাটাচ্ছি তাই আমাদের সৎ বা অসৎ গুণের পরিচয় দেয়। নৈতিকতার অর্থ বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে। আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে আমরা যদি আধ্যাত্মিক শিক্ষা বাদ দিই তবে সেটি হবে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিপন্থী।'' বাস্তবিক যখন আমরা আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত হই তখনই নৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলি আমাদের মজ্জাগত হয়।

সুতরাং, মূল্যবোধ হ'ল মূলত সেই উপায় যা আমাদেরকে আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার পথে এগিয়ে দেয়। এগুলি স্বভাবতই আমাদের অন্তরের দেবত্বের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ-নির্দেশ করে।

[গ] আধ্যাত্মিক উন্নতি

১.৪ আমাদের অন্তর্নিহিত দেবত্ব ঃ

মানুষ স্বরূপতঃ দেবতা। পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মই বলে যে আমাদের এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল শরীর-মনের অন্তরালে রয়েছে একটি শাশত সত্তা যেটিই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ। এই অন্তর্নিহিত দেবত্বই আমাদের সমস্ত জ্ঞান, আনন্দ এবং উৎকর্ষতার আকর।

১.৫ আধ্যাত্মিক উন্নতির অর্থ আত্ম-সচেতনতার বিস্তার ঃ

বহু শতাব্দী আগে আমাদের মুনি-ঋষিরা আবিষ্কার করেছিলেন যে মানুষের চিন্তাভাবনা, আবেগ, কাজকর্ম ইত্যাদি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রয়েছে তার চেতনার স্তর-এর সাথে। আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে একজন ব্যক্তির নিজের সম্পর্কে ধারণাটিই নির্ধারণ করে দেয়, সে কিরকম লক্ষ্যে পৌঁছাতে চাইবে।

আমাদের চেতনা যদি শরীর ও মনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তবে জীবন সম্পর্কে এক আত্মকেন্দ্রিক ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল অতৃপ্ত বাসনা, মানসিক চাপ ও সংঘাত। কাজেই আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যা সমাধানের উপায় হল আমাদের চেতনাবোধ বা আত্মসচেতনতার উন্নতি। এই দেহ-মনের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের অন্তর্নিহিত দেবত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়াই আধ্যাত্মিক উন্নতি।

১.৬ আত্মিক উন্নতি আমাদের নৈতিক জীবনকে কার্যকরী করেঃ

একটি স্বতঃস্ফূর্ত নৈতিক জীবন যাপন নির্ভর করে আধ্যাত্মিক উন্নতির উপর। সত্যি কথা বলতে, একমাত্র আধ্যাত্মিকচেতনার আবির্ভাবেই নৈতিক জীবন প্রকৃতপক্ষে কার্যকর হয়। নৈতিক জীবনযাপন প্রসঙ্গে অনেকের মনে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে ''আমি কেন পবিত্র থাকব? কেন আমি অন্যের মঙ্গল করব?'' আধ্যাত্মিক জীবনদর্শনের নিরিখে পূর্বোক্ত প্রশ্নের সুনিশ্চিত উত্তরটি হবে—পবিত্রতা ছাড়া আমরা অন্তরের পরিপূর্ণতা ও দেবত্বকে প্রকাশ করতে পারব না। আর অন্যের উপকার করতে হবে কারণ আমি ও তারা এক। কারণ, সমগ্র বিশ্বে একই চৈতন্য সত্তা অনুস্যূত। বাস্তবিক, এই পৃথিবীতে যে পার্থক্য আমরা দেখি তা শুধু নামে ও রূপে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে, এই জগতের সবচেয়ে নিম্নস্তরের সৃষ্টি থেকে সর্বোচ্চ ও পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি পর্যন্ত—সবার মধ্যেই একত্ব বিদ্যমান। নীতিশাস্ত্র বা নৈতিকতা বহুর মধ্যে এই এক কে খোঁজার প্রচেষ্টা। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ ''একমাত্র অনন্ত সত্য তোমাতে—আমাতে—আমাদের সকলের আত্মায় বর্তমান রহিয়াছেন—সেই সনাতন আত্মতত্ত্ব ব্যতীত নীতিবিজ্ঞানের এই সনাতন ভিত্তি আর কি হইতে পারে? আমার অনন্ত একত্বই সর্বপ্রকার নীতির মূলভিত্তি। তোমাতে আমাতে শুধু 'ভাই ভাই' সম্বন্ধ নহে,—মানবের দাসত্বশৃঙ্খল মোচন চেষ্টার বর্ণনাপূর্ণ সকল গ্রন্থে এই 'ভাই ভাই'—ভাবের কথা আছে এবং শিশুতুল্য ব্যক্তিরাই তোমাদের নিকট উহার প্রচার করিয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তুমি আমি এক—ভারতীয় দর্শনের ইহাই সিদ্ধান্ত। সর্বপ্রকার নীতি ও ধর্ম বিজ্ঞানের মূলভিত্তি এই একত্ব।'' (বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৫৯-৬০, অষ্টাদশ সংস্করণ)

১.৭ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করেঃ

জগতের একত্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা যতই সুস্পষ্ট হয়, ততই

ভয়, ঈর্ষা, দুঃখ, ক্রোধ ইত্যাদি ক্ষতিকারক আবেগগুলি থেকে আমরা মুক্ত হই এবং স্বভাবতঃই আমাদের অন্তরে প্রকৃত সমন্বয়বোধের আবির্ভাব হয়। অন্তরের এই স্থৈর্য, শান্তি ও আনন্দের অনুভূতি বাইরে প্রকাশ পায় বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ বা প্রকৃত সামাজিকবোধের মধ্য দিয়ে। আবার, সবার জন্যে ভালোবাসার প্রকাশ হয় নিঃস্বার্থ সেবা, ধার্মিক উদারতা ও দৃঢ় নাগরিক কর্তব্যবোধের মধ্য দিয়ে। বাস্তবিক, পারস্পরিক সম্পর্কগুলি তখন দেবত্বমণ্ডিত হয় এবং কর্মক্ষেত্রে নৈতিক আদর্শ এবং কর্মকুশলতা ইত্যাদি মূল্যবোধগুলির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ হয়। স্বামী বিবেকানন্দ সেইজন্য যথার্থই ঘোষণা করেছিলেন যে ''মানুষের অন্তরের দেবত্বের প্রকাশই হল সভ্যতা।''

১.৮ আধ্যাত্মিক উন্নতিই সর্বরোগহর মহৌষধ ঃ

ভারতের জাতীয় জীবনের চালিকা শক্তিটি হল ধর্ম। যে কোন সামাজিক পরিবর্তনের জন্য এটি হল স্বাভাবিক ও সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। স্বামী বিবেকানন্দ এই সত্যের উপর বারবার জোর দিয়ে বলেছেন যে ঃ ''প্রত্যেক জাতিরই জীবনের এক একটি উদ্দেশ্য আছে। প্রত্যেক জাতিই প্রাকৃতিক নিয়মে কতকগুলি বিশেষত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সকল জাতি মিলিয়া যেন এক মহা ঐকতান বাদ্যের সৃষ্টি করিয়াছে—প্রত্যেক জাতিই যেন উহাতে এক একটি পৃথক পৃথক সুর দিতেছে। উহাই তাহার জীবনীশক্তি। উহাই তাহার জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, মূলভিত্তি। আমাদের এই পবিত্র মাতৃভূমির মূলভিত্তি, মেরুদণ্ড বা জীবনকেন্দ্র একমাত্র ধর্ম। অপরে রাজনীতির কথা বলুক, বাণিজ্যবলে অগাধ ধনরাশি উপার্জনের গৌরব, বাণিজ্যনীতির শক্তি ও উহার প্রচার, বাহ্য স্বাধীনতালাভের অপূর্ব সুখের কথা বলুক। হিন্দু এ সকল বোঝে না, বুঝিতে চাহেও না। তাহাদের সহিত ধর্ম, ঈশ্বর, আত্মা, মুক্তি—এ-সকল সম্বন্ধে কথা বলুন। আমি আপনাদিগকে নিশ্চয়ই বলিতেছি, অন্যান্য দেশের অনেক তথাকথিত দার্শনিক অপেক্ষা আমাদের দেশের সামান্য কৃষক পর্যন্ত এ-সকল তত্ত্বসম্বন্ধে

অধিকতর অভিজ্ঞ। ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদিগকে বলিয়াছি, এখনও আমাদের জগৎকে শিখাইবার কিছু আছে। এই জন্য শত শত বর্ষের অত্যাচার এবং প্রায় সহস্র বর্ষের বৈদেশিক শাসনের পীড়নেও এই জাতি এখনও জীবিত রহিয়াছে। এই জাতি এখনও জীবিত, কারণ এখনও এই জাতি ঈশ্বর ও ধর্মরূপ মহারত্নকে পরিত্যাগ করে নাই।" (বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩০, অষ্টাদশ সংস্করণ) তাই, জাতির সামগ্রিক উন্নতির জন্য এই আধ্যাত্মিক উৎস থেকে জীবনীশক্তি আহরণ করা আমাদের আবশ্যিক কর্তব্য। বাস্তবিক, যদি আমাদের জাতীয় জীবন আধ্যাত্মিক আদর্শ থেকে সরে যায় তবে সেই জাতীয় বিকাশটি হবে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক এবং অনিবার্যভাবে তা সামাজিক অবক্ষয় ডেকে আনবে। স্বামী বিবেকানন্দ তাই সাবধান করে দিয়েছেন যে ঃ ''তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্যজাতির জড়বাদ-সর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে। ধর্ম ছাড়িয়া দিলে হিন্দুর জাতীয় মেরুদণ্ডই ভাঙিয়া যাইবে—যে ভিত্তির উপর জাতীয় সুবিশাল সৌধ নির্মিত হইয়াছিল, তাহাই ভাঙিয়া যাইবে; সুতরাং ফল দাঁড়াইবে—সম্পূর্ণ ধ্বংস।" (বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩৪, অষ্টাদশ সংস্করণ)

একটি প্রাণবন্ত আধ্যাত্মিক জীবনাদর্শই আমাদের সমস্ত সামাজিক সমস্যার মহৌষধ ঃ ''ধর্মই আমাদের শোণিতস্বরূপ। যদি সেই রক্তপ্রবাহ চলাচলের কোন বাধা না থাকে, যদি রক্ত বিশুদ্ধ ও সতেজ হয়, তবে সকল বিষয়েই কল্যাণ হইবে। যদি এই 'রক্ত' বিশুদ্ধ হয়, তবে রাজনীতিক, সামাজিক বা অন্য কোনরূপ বাহ্য দোষ, এমনকি আমাদের দেশের ঘোর দারিদ্র্যদোষ—সবই সংশোধিত হইয়া যাইবে।" (বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৪১-৪২, অষ্টাদশ সংস্করণ)

আমাদের সামনে এখন সবচেয়ে জরুরী কাজ হল আমাদের আধ্যাত্মিক খুঁটিটিকে শক্ত করা। আধ্যাত্মিকতায় আমরা বিশ্বাস করি বা না করি, আমাদের প্রত্যেককে আধ্যাত্মিক শক্তিতে ভরসা রাখতে হবে জাতীয়

জীবনাদর্শের খাতিরে। যে কোন নতুন ধারণা (তা যেখান থেকেই আসুক না কেন) তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যদি তা এই জাতীয় আদর্শের ভাবে সঞ্জীবিত হয়।

১.৯ আত্মিক শক্তিতে বলিয়ান নাগরিকের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ঃ

নৈতিকতার সুদৃঢ় অনুশীলনেই আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আমাদের জাতীয় জীবনের ধারাটিকে অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব। আমাদের সমাজের পুনর্গঠন নির্ভর করবে নৈতিক তথা আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান নাগরিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতায়। একমাত্র, এই ধরণের পুরুষ ও মহিলারাই দৈনন্দিন জীবনে আধ্যাত্মিকতাকে বাস্তবায়িত করতে পারবেন এবং জাতীয় পুনর্গঠনের সুমহান কর্তব্যটি পালনে সমর্থ হবেন। সমাজ জীবনের প্রকৃত উৎকর্ষতা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের একটি সুগভীর মন্তব্য অত্যন্ত প্রনিধানযোগ্য ঃ ''সেই সমাজই সর্বশ্রেষ্ঠ, যেখানে সর্বোচ্চ সত্য কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে, ইহাই আমার মত। আর যদি সমাজ উচ্চতম সত্যের উপযুক্ত না হয়, তবে উহাকে উপযুক্ত করিয়া লও। যত শীঘ্র করিতে পারো ততই মঙ্গল।" (বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৮, ঊনবিংশতি সংস্করণ)

অধ্যায় ২ আদর্শ চরিত্র হওয়া

আপনার নিজের জীবনটি যাতে আপনার সন্তান বা ছাত্রের কাছে একটি অনুসরণীয় আদর্শ জীবন হয়ে ওঠে, তার জন্য আপনাকে অবশ্যই

ক) জীবনে একটি মহান আদর্শকে ধরে রাখতে হবে এবং

খ) ঐ আদর্শ উপলব্ধি করার পদ্ধতিটি বুঝে তা জীবনে রূপায়িত করতে হবে।

২.১ আদর্শ ছাড়া উন্নতি হয় না।

জীবনে আদর্শ থাকার গুরুত্ব সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ জোর দিয়ে বলেছেন ''যাহার একটি নির্দিষ্ট আদর্শ আছে, সে যদি হাজারটি ভ্রমে পতিত হয়, যাহার কোনরূপ আদর্শ নাই, সে তবে পঞ্চাশ হাজার ভ্রমে পতিত হইবে, ইহা নিশ্চয়। অতএব একটি আদর্শ থাকা ভাল। এই আদর্শ সম্বন্ধে যত বেশী পারা যায়, শুনিতে হইবে; ততদিন শুনিতে হইবে—যতদিন না উহা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে, আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে, যতদিন না আমাদের রক্তের ভিতর প্রবেশ করে, যতদিন না উহা আমাদের প্রতি শোণিতবিন্দুতে ধ্বনিত হয়, যতদিন না উহা আমাদের শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ব্যাপ্ত হইয়া যায়। অতএব আমাদিগকে প্রথমে এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে হইবে।" সরল কথায়, একটি উন্নত আদর্শ ভিন্ন জীবনের প্রকৃত উন্নতি কখনই সম্ভব নয়। সেইহেতু, আপনার জীবনের অভ্রান্ত দিশারী হিসেবে একটি মহান আদর্শ থাকা অত্যন্ত জরুরী। (বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৩৩-৩৪, ঊনবিংশতি সংস্করণ)

২.২ ভারতের জাতীয় আদর্শ

সুপ্রাচীন কাল থেকে আত্মিক সংযম ও নিঃস্বার্থ সেবা আমাদের সমাজের আদর্শ। তাই, আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিতে মহিমময় বীরের স্থানটি সবসময় পেয়ে এসেছেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী (যাঁর মধ্যে এই আদর্শগুলি বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেছে) —কখনই শৌর্যশালী রাজা নন। বাস্তবিক, আমাদের পূর্বপুরুষেরা, রাজা থেকে সাধারণ মানুষ, সবাই খুঁজেছেন, ''কৌপীনধারী অরণ্যবাসী ফলমূলাহারী বেদাধ্যায়ী কোন্ প্রাচীন ঋষি হইতে তাঁহাদের বংশের উৎপত্তি''। (বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৬৬, অষ্টাদশ সংস্করণ)

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর উদ্দীপনাময় আহ্বানে আমাদের জাতির আদর্শের একটি সুস্পষ্ট ছবি দিয়েছেন। এই আহ্বানটি মন্ত্রের মতই শক্তিশালী, তাই একে 'স্বদেশ মন্ত্র' বলা হয় ঃ ''হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।' (বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৯৪, ষোড়শ সংস্করণ)

২.৩ জাতীয় পুর্নজাগরণের আদর্শ

ভারতবর্ষের নবজাগরণের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ দুটি প্রাচীন আদর্শকে তুলে ধরেছেন ঃ ''ত্যাগ ও সেবাই' ভারতের জাতীয় আদর্শ—ঐ দুইটি বিষয়ে উহাকে উন্নত করুন, তাহা হইলে অবশিষ্ট যাহা কিছু আপনা হইতেই উন্নত হইবে।'' এই দুই জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতেই আপনার মহৎ জীবনটি গড়ে তুলতে হবে। এই আদর্শ দুটিই আপনার সমস্ত উদ্দেশ্যের কষ্ঠিপাথর হিসাবে কাজ করবে এবং আপনাকে আদর্শ পিতা-মাতা বা শিক্ষক হওয়ার অনুপ্রেরণা তথা শক্তি যোগাবে। (বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ৩১০, পঞ্চদশ সংস্করণ)

২.৪ ত্যাগের আদর্শ

ত্যাগ বলতে কি বোঝায়? ত্যাগের অর্থ হল আত্ম-উৎসর্গ অর্থাৎ অন্যের মঙ্গলের জন্য আমাদের অহংবোধ, স্বার্থপরতা, বাসনা, পছন্দ ও অপছন্দ ইত্যাদি নিঃশেষে বলিদান দেওয়া। এই আত্ম-বলিদানই হল নৈতিকতার সারকথা। আত্ম-ত্যাগের আদর্শে আমাদেরকে উদ্দীপিত করার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ আহ্বান জানিয়েছেন ঃ ''জগৎকে আলো দেবে কে? আত্মবিসর্জনই ছিল অতীতের কর্ম রহস্য; হায়! যুগ যুগ ধরে তাই চলতে থাকবে। যাঁরা জগতে সবচেয়ে সাহসী ও বরেণ্য, তাঁদের চিরদিন 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' আত্মবিসর্জন করতে হবে। অনন্ত প্রেম ও করুণা বুকে নিয়ে শত শত বুদ্ধের আবির্ভাব প্রয়োজন।'' আপনি যদি প্রশ্ন করেন যে 'আমাদের সবাইকে কেন আত্মত্যাগ করতে হবে?' তার উত্তর হল ঃ

১) এর দ্বারা আমরা ঈর্ষা, ভয়, সন্দেহ ও দুশ্চিন্তা কাটিয়ে উঠবো।

২) আত্মত্যাগ আমাদের মনকে পবিত্র করবে এবং শান্তি ও আনন্দে মনকে পূর্ণ করবে।

৩) এর দ্বারা আমরা অন্যের সাথে সম্পূর্ণ অকপট ও আনন্দময় সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবো।

৪) সর্বোপরি, এর মধ্য দিয়ে সমাজের অশেষ কল্যাণ হবে।

যে পরিবারের বেশীর ভাগ সদস্যের মধ্যে এই ত্যাগের মনোভাব প্রকাশ পায়, সেই পরিবার একটি সুখী পরিবার হয়ে ওঠে। যে ব্যক্তি এই ত্যাগের অভ্যাস সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারেন তিনি সবার শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন।

বাস্তবিক, ত্যাগের মূলকথা হল স্বার্থপরতার বলিদান। আপনার মধ্যে এই ত্যাগের মনোভাবের প্রকাশ ঘটে যখন আপনি বাবা-মা হিসাবে আপনার নিজের ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছেলে-মেয়েদের জন্য নির্দ্বিধায় বিসর্জন দেন। আবার শিক্ষক হিসাবে আপনি প্রায়শই আপনার ব্যক্তিগত সময় ছাত্রদের জন্য অতিবাহিত করেন। এই ধরণের আত্মত্যাগ তখনই সম্ভব হয় যখন আপনার সন্তান বা ছাত্রের সাথে আপনার একাত্মবোধের অনুভূতি আসে। বাস্তবিক আমাদের উদ্দেশ্যটি হবে—এই একাত্মবোধের অনুভূতিটি উত্তোরত্তর বৃদ্ধি করে সমগ্র সমাজের সাথে একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা। এর মাধ্যমে আমরা সমাজের প্রত্যেকের প্রয়োজন ও সমস্যা সম্পর্কে সংবেদনশীল হয়ে উঠব। হৃদয় ও মনের এধরণের প্রসারের প্রথম ধাপটি বাইবেলের একটি অমর বাণীর মধ্যে বিধৃত—'আপনি নিজেকে যতটা ভালোবাসেন আপনার প্রতিবেশীকে ততটাই ভালোবাসুন।'

প্রকৃতপক্ষে, নিস্বার্থপরতার অনুশীলনই আপনাকে পূর্ণতার পথে নিয়ে যাবে। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের কথাগুলি আমরা স্মরণ করতে পারি ঃ ''নিঃস্বার্থ কর্মেই অধিক লাভ, তবে ইহা অভ্যাস করিবার সহিষ্ণুতা মানুষের নাই। সাংসারিক হিসাবেও ইহা বেশী লাভজনক। প্রেম, সত্য, নিঃস্বার্থপরতা-এগুলি শুধু নীতি সম্বন্ধীয় আলঙ্কারিক বর্ণনা নয়, এগুলি আমাদের সর্বোচ্চ আদর্শ; কারণ এগুলির মধ্যেই মহতী শক্তি নিহিত রহিয়াছে। প্রথমতঃ যে-ব্যক্তি পাঁচ দিন অথবা পাঁচ মিনিট কোন স্বার্থাভিসন্ধি ব্যতীত ভবিষ্যতের কোন চিন্তা, স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষা, শাস্তির ভয় অথবা ঐরূপ কোন বিষয় চিন্তা না করিয়া কাজ করিতে পারেন, তাঁহার মধ্যে শক্তিমান্ মহাপুরুষ হইবার সামর্থ্য আছে। এইভাব কার্যে পরিণত

করা কঠিন, কিন্তু আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে আমরা উহার মূল্য জানি, জানি উহা কত শুভফলপ্রসু। এই কঠোর সংযমই শক্তির মহোচ্চ বিকাশ। সমুদয় বর্হিমুখ কার্য অপেক্ষা আত্মসংযমেই অধিকতর শক্তির প্রকাশ। চতুরশ্ববাহিত একটি শকট কোন বাধা না পাইয়া পাহাড়ের ঢালু পথে গড়াইয়া যাইতেছে, অথবা শকটচালক অশ্বগণকে সংযত করিতেছে-ইহাদের মধ্যে কোনটি অধিকতর শক্তির বিকাশ? অশ্বগণকে ছাড়িয়া দেওয়া বা উহাদিগকে সংযত করা? একটি কামানের গোলা বায়ুর মধ্য দিয়া উড়িয়া অনেক দূরে গিয়া পড়ে, অন্য একটি গোলা দেওয়ালে লাগিয়া বেশী দূরে যাইতে পারে না, কিন্তু এই সংঘর্ষে প্রবল তাপ উৎপন্ন হয়। এইরূপে মনের সমুদয় বহির্মুখ শক্তি স্বার্থের উদ্দেশ্যে ধাবিত হইয়া বিক্ষিপ্ত হয়, ঐগুলি আর তোমার নিকট ফিরিয়া আসিয়া তোমার শক্তি-বিকাশে সাহায্য করে না, কিন্তু ঐগুলিকে সংযত করিলে তোমার শক্তি বর্ধিত হইবে। এই সংযম হইতে মহতী ইচ্ছা-শক্তি উদ্ভূত হইবে; উহা খ্রীষ্ট বা বুদ্ধের মতো চরিত্র সৃষ্টি করিবে।" (বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪১-৪২, দ্বাবিংশত সংস্করণ)

২.৫ সেবার আদর্শ

ত্যাগ ও সেবা এই আদর্শ দুটি একে অন্যের পরিপূরক। ত্যাগের ভাব না থাকলে সেবা সম্ভব নয়। আবার সেবা না করলে ত্যাগ সম্পূর্ণ হয় না। বুদ্ধদেব দেখিয়েছেন যে সব ধর্মেরই সার কথা হল ''নিজে ভাল হওয়া এবং অন্যের উপকার করা।" আমাদের মধ্যে ত্যাগের আদর্শ তখনই পূর্ণতা লাভ করবে যখন আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্যকে ভালবাসতে এবং তাদেরকে সেবা করতে সমর্থ হব। অবশ্য, শারীরিক ভাবে সেবা করা অথবা দান করাই ত্যাগের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য নয়। এর আসল কথাটি হল মানুষকে ঈশ্বর ভেবে তার সেবা করা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রদত্ত ''শিবজ্ঞানে জীব সেবা" রূপ সুমহান বাণীটির অর্থ হল মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের দিব্য উপস্থিতি অনুভব করে তার সেবা করা। সেবার অর্থ কখনই দয়া দেখানো নয়—বিনম্র শ্রদ্ধার ভাব প্রকৃত সেবার সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে আছে।

এই অসাধারণ বাণীটিকে সমাজ জীবনে রূপ দেওয়ার দায়িত্বটি অর্পিত হয়েছিল স্বামী বিবেকান্দের ওপর, যিনি পরবর্তীকালে বলেছিলেন ঃ ''আমি এত তপস্যা করে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন; তা ছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নেই। —'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' (বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ১৫০, পঞ্চদশ সংস্করণ)

অন্যের জন্য করা ক্ষুদ্রতম সেবাও আমাদের অন্তরের দেবত্বকে জাগিয়ে তোলে। কিন্তু এইরূপ সেবার জন্য দরকার একটি গভীর হৃদয় বত্তা যা দিয়ে অন্যের কষ্টকে তীব্রভাবে অনুভব করা যাবে এবং তার সাথে অবশ্যই থাকবে ফলের প্রতি পূর্ণ নির্লিপ্ততা। স্বামী বিবেকানন্দ উপদেশে বলেছেন ঃ ''শিশুসন্তানদিগকে কিছু দিলে তোমরা কি তাহাদের নিকট হইতে কিছু প্রতিদান চাও ? তাহাদের জন্য কাজ করাই তোমার কর্তব্য, ঐখানেই উহার শেষ। কোন বিশেষ ব্যক্তি নগর বা রাষ্ট্রের জন্য যাহা করে, তাহা করিয়া যাও, কিন্তু সন্তানদের প্রতি তোমার যেরূপ ভাব উহাদের প্রতিও সেই ভাব অবলম্বন কর, উহাদের নিকট হইতে প্রতিদানস্বরূপ কিছু আশা করিও না।'' (বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬৪-৬৫, দ্বাবিংশতি সংস্করণ)

এইভাবে কাজ করাকেই নিষ্কাম কর্ম বা নির্লিপ্তভাবে কাজ করা বলে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যারা সেবা পাচ্ছে, তাদের পরিপ্রেক্ষিতে, সেবার উদ্দেশ্যটি কি ? বস্তুত, সেবার উদ্দেশ্য শুধু একটি দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক গড়ে তোলা নয়—সেবার মাধ্যমে ''আমরা পরস্পর পরস্পরের জন্য'' এই বোধটি যেন আমাদের মধ্যে সম্যক রূপে বিকশিত হয় এবং সেবার মাধ্যমে সেব্যের যেন জাগতিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সর্ববিধ কল্যাণ সাধিত হয়।

২.৬ পাঁচটি প্রধান ত্যাগ

সেবার ধারণাটি শুধু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না—এটি

প্রসারিত হবে নিখিল বিশ্বের সবার প্রতি। আমাদের শাস্ত্রে একজন গৃহস্থের জন্য পাঁচরকম ত্যাগের নিয়ম নির্দিষ্ট আছে। এগুলি হল দেবতাদের জন্য, পূর্বপুরুষদের আত্মার জন্যে, সাধুদের জন্য, মানবসমাজের জন্য এবং মনুষ্যেতর জীবের জন্য ত্যাগ করা। জন্মগ্রহণের ফলে আমাদের উপর যে পাঁচটি ঋণের বোঝা চাপে তা আমরা শোধ করতে পারি এই ত্যাগের দ্বারা। এই ঋণগুলি হল—

১) দেবঋণ অর্থাৎ আমাদেরকে এই বাতাস, সূর্য, মাটি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, বাক্‌শক্তি ইত্যাদি উপহার দেওয়ার জন্য দেব-দেবীদের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ।

২) ঋষিঋণ বা মুনি-ঋষিরা নিজেদের চেষ্টায় যে সর্বোচ্চ সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন এবং তা আয়ত্ত করার জন্য যে নীতি ও পদ্ধতি আমাদের দিয়েছিলেন তার জন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ।

৩) পিতৃঋণ বা পিতা-মাতা ও পূর্বপুরুষের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ, আজ আমরা যা হয়েছি তার পিছনে তাঁদের অবদানের জন্য।

৪) নৃঋণ বা সমগ্র মানুষজাতির প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ, যারা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

৫) ভূতঋণ অর্থাৎ মনুষ্যেতর প্রাণী--- পশু, পাখী ইত্যাদির কৃতজ্ঞতাবোধ।

২.৭ 'ত্যাগ' ও 'সেবা' এই দুটি আদর্শই ছিল আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান প্রেরণা

আমাদের মনে রাখতে হবে যে ত্যাগ ও নিঃস্বার্থপর সেবা—এই দুই প্রাচীন আদর্শের পুনরুত্থানই আমাদেরকে প্রবল প্রতাপশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য এক সফল সংগ্রাম করার শক্তি দিয়েছিল। সত্যের প্রতি অটল নিষ্ঠা, সিংহের মত সাহস, সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগ, কঠোর সংযমী জীবন এবং দেশ সেবার জন্য জ্বলন্ত প্রেম আমাদের হাজার

হাজার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের চরিত্রবল যুগিয়েছিল।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী তাঁর সফল আইনজীবীর পেশা ছেড়ে দিয়ে ও নিজের সংসারের ভবিষ্যতের কথা না ভেবে দেশবাসীর রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন ও পরে 'মহাত্মা গান্ধী'তে পরিণত হয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র বোস আই সি এস পরীক্ষা পাস করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক ভাবী প্রশাসক হওয়ার সুযোগ ছেড়ে দিয়ে ব্রিটিশের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে ও শেষপর্যন্ত নিজের জীবন বলিদান দিয়ে 'নেতাজী' সুভাষচন্দ্র বোস হিসাবে অমর হয়ে আছেন।

শ্রী চিত্তরঞ্জন দাশ একজন নামী ও সফল আইনজীবী হয়েও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পক্ষে আদালতে লড়াই করার জন্য নিজের সব সম্পত্তি ও সময় বিলিয়ে দিয়ে 'দেশবন্ধু' চিত্তরঞ্জন দাশে পরিণত হন।

সেইজন্য আমাদের সংবিধানের প্রাথমিক দায়িত্বের মধ্যে একটি হল, ''যে মহান আদর্শগুলি আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য উদ্দীপনা দিয়েছিল সেগুলি অনুসরণ করা ও হৃদয়ে পোষণ করা।''

অধ্যায় ৩

আদর্শের অনুশীলন

৩. 'ত্যাগ' ও 'সেবা'—এই যুগ্ম আদর্শ অনুশীলনের পদ্ধতি

আদর্শ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা হওয়ার পর, পরবর্তী ধাপটি হবে এই আদর্শকে জীবনে রূপায়িত করার উপায়গুলি সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হওয়া। বস্তুত, 'ত্যাগ' ও 'সেবা'-এই যুগ্ম আদর্শের ব্যবহারিক প্রয়োগকে সফল করতে হলে, নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলির অনুশীলন অবশ্য কর্তব্য।

১) মহৎ ইচ্ছার তীব্রতা বাড়ানোর অনুশীলন।

২) স্থূল আনন্দ বর্জন করে বিশুদ্ধ আনন্দের অনুশীলন।

৩) নৈতিক জীবনযাপনের ব্রত গ্রহণ এবং প্রার্থনা।

৪) 'কর্ম যোগের রহস্য অবগত হওয়া।

৫) সমাজজীবনে আদর্শের প্রতি তীব্র আনুগত্য।

৩.১ অনুভূতির তীব্রতা বাড়ানোর অভ্যাস করা

আদর্শ পিতা-মাতা বা শিক্ষকের ভূমিকা পালনের জন্য সীমিত সময়ে একটি মহৎ প্রচেষ্টার অনুষ্ঠানে আমরা কতটা সফল হতে পারব তা নির্ভর করে আমাদের ইচ্ছের তীব্রতা কতটা তার উপর। আদর্শ বাবা-মা বা শিক্ষক হয়ে ওঠার জন্য এই তীব্র ইচ্ছার প্রয়োজন। বাস্তবিক, আপনার এই মহৎ ইচ্ছাই আপনাদের সন্তান বা ছাত্রের মধ্যে চরিত্র গঠনের তীব্র ইচ্ছা জাগাবে।

সময় নদীর স্রোতের মত বয়ে যায়। আপনার সন্তান ও ছাত্রের মধ্যে প্রতিদিনই নতুন নতুন সংস্কার তৈরী হচ্ছে। আদর্শ পিতা-মাতা বা শিক্ষকের

ভূমিকায় অংশ নেওয়ার জন্য মাত্র কয়েকটি বছর আপনি পাবেন। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আপনি তাদেরকে মহান আদর্শের ভাবে অনুপ্রাণিত করতে যদি ব্যর্থ হন তাহলে হঠাৎ একদিন উপলব্ধি করবেন যে আপনার ছেলে/মেয়ে বা ছাত্র বড় হয়ে গেছে এবং আপনার উপদেশ শোনার জন্য তারা আর মানসিকভাবে আগ্রহী নয়।

৩.২ আনন্দের বিশুদ্ধিকরণ

মানুষের কাজ করার একটি মূল উদ্দেশ্য হল আনন্দ পাওয়া। কিন্তু কিভাবে আপনি আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা করছেন তা চরিত্র গঠনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনার আনন্দের অনুভূতি বিশুদ্ধ না হয় তবে 'ত্যাগ' ও 'সেবা'র অনুশীলন কখনই সফল হবে না। আনন্দকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ

১) শারীরিক আনন্দ যা ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে অনুভব করা যায়।

২) বৌদ্ধিক আনন্দ যা মানসিক চর্চার দ্বারা পাওয়া যায়।

৩) আধ্যাত্মিক আনন্দ যা আত্মানুভূতির দ্বারা লাভ করা যায়।

আনন্দ অনুভব করার এই বিভিন্ন পথ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—''সকল জাতির মধ্যেই দেখা যায়, নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকেরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সুখভোগ করে এবং শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন লোকেরা চিন্তায়, দর্শনে, বিজ্ঞানে ও শিল্পকলায় সেই সুখ পাইয়া থাকে। আধ্যাত্মিকতার রাজ্য আরও উচ্চতর। উহার বিষয়টি অনন্ত হওয়ায় ঐ রাজ্যও সর্বোচ্চ এবং যাহারা উহা সম্যকরূপে ধারণা করিতে পারে, তাহাদের পক্ষে ঐ স্তরের সুখও সর্বোৎকৃষ্ট। সুতরাং 'মানুষকে সুখানুসন্ধান করিতে হইবে' হিতবাদীর এই মত মানিয়া লইলেও মানুষের পক্ষে ধর্মচিন্তার অনুশীলন করা উচিত; কারণ ধর্মানুশীলনেই উচ্চতম সুখ আছে।" (বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৯২, অষ্টাদশ সংস্করণ)

৩.২.১ শারীরিক আনন্দ

আধুনিক জগতে সবাই কেবল ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই পৃথিবীর আনন্দ ভোগ করতে চায়। রোজই নতুন নতুন জিনিষ থেকে আনন্দ পাওয়ার খোঁজে সবাই পাগলের মত দৌড়াচ্ছে। শুধু ইন্দ্রিয়সুখের জন্য ব্যস্ত থাকলে আমাদের মন পশুর স্তরে নেমে যায়। তখন আমাদের মনে ভোগের তীব্র বাসনা জাগে, আবার সেই জিনিস পাওয়ার পরেও তা হারাবার দুশ্চিন্তা মনের মধ্যে চলতে থাকে। তার পরে একটা সময় আসে যখন ইন্দ্রিয়গুলির সুখ অনুভব করার ক্ষমতাও চলে যায়। যদি তখনো আমাদের মনে এই ইন্দ্রিয়সুখের তৃষ্ণা জাগরূক থাকে তাহলে আমরা মানসিক কষ্ট ও হতাশার শিকার হই। তাছাড়া এটা সার্বজনীন অভিজ্ঞতা যে ইন্দ্রিয়সুখকে প্রশ্রয় দিলে কখনো তার তৃপ্তি হয় না। বাস্তবিক যখন ইন্দ্রিয়ই আমাদের আনন্দের প্রধান বা একমাত্র মাধ্যম হয়ে ওঠে, তখন আমরা আবশ্যিকভাবে নানা সমস্যা ডেকে আনি। তাই বুদ্ধিমান বিবেকী ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয় সুখজাত আনন্দ থেকে নিজেদের বিরত রাখেন।

৩.২.২ বৌদ্ধিক আনন্দ

সঙ্গীত, ছবি আঁকা, ভাস্কর্য, নাচ ইত্যাদি সুকুমার শিল্প শিখলে ও চর্চা করলে মনের প্রসার ও উন্নতি হয়। রামায়ণ ও মহাভারত এই দুটি মহাকাব্য মন দিয়ে পড়লে মূল্যবোধের গভীর শিক্ষা হয়। এগুলির অসংখ্য গল্প ও চরিত্র শিক্ষিত বা সাধারণ মানুষ উভয়েরই হৃদয় ছুঁয়ে যায়। আমাদের কলা, সঙ্গীত ও সাহিত্যের প্রেরণার অনন্ত উৎস এই দুই মহাকাব্য। সারা দেশে অসংখ্য বাউল, হরিকথার কথক ও সাধুরা এই দুই মহাকাব্য থেকে গল্প বলেন। এই গল্পগুলিতে বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী ও সঙ্কটময় অবস্থার বর্ণনা আছে যেগুলি থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নেওয়ার শৈলী জানতে পারি। ধর্ম বা ন্যায়পরায়ণতার সূক্ষ্মবিচার এই গল্পগুলিতে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই মহাকাব্যগুলির সুবৃহৎ প্রেক্ষাপটে অসংখ্য ব্যক্তিত্বের বর্ণনা আছে যা বিভিন্ন ধরণের মনুষ্য চরিত্র ও জীবনের সাথে আমাদের

পরিচয় করিয়ে দেয়।

মহাভারতের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল পবিত্র ভগবদ্‌গীতা যা শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন। আমাদের সনাতন ধর্ম বা হিন্দুত্বের তিনটি প্রধান পাঠ্যের মধ্যে এটি একটি। যুগ যুগ ধরে এই গ্রন্থটি আমাদের দেশের সাধু-সন্ত, রাজা-মহারাজা, রাষ্ট্রশাসক, ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রামে তাঁদের স্ব স্ব কর্মপ্রণালীর অভ্রান্ত নির্দেশিকা হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও পরিচালন (management) বিদ্যার প্রতিষ্ঠানেও এখন এই গ্রন্থের চর্চা শুরু হয়েছে।

৩.২.৩ আধ্যাত্মিক আনন্দ

অবতার ও সাধুসন্তদের জীবনী ও বাণী পাঠ করা শুদ্ধ চিন্তার অনুশীলনের একটি সহজ উপায়। নিয়মিত শাস্ত্রপাঠ, ধ্যান ও ভগবানের নাম জপ করা আধ্যাত্মিক আনন্দলাভের একটি শক্তিশালী সহায়ক। আরেকটি পথ হল কিছু মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজা, যেমন, আমি কে? জীবনের উদ্দেশ্য কি? আমি কোথায় যাচ্ছি? মৃত্যু কি? ইত্যাদি। এই মৌলিক প্রশ্নগুলি আমাদের জানার ইচ্ছাকে সত্যাভিমুখী করে তোলে এবং ভোগেচ্ছাকেও অবদমিত করে।

৩.৩ বাসনা ও ক্রোধের নিয়ন্ত্রণ

শ্রীমদ্‌ভগবদগীতায় অর্জুন নৈতিক জীবন ও তার অনুশীলনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন ঃ 'হে কৃষ্ণ! মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে তাকে জোর করে পাপ কাজ করায়?'

শ্রীভগবান উত্তর দিচ্ছেন ঃ ''রজোগুণ থেকে এই কামনার জন্ম হয় এবং এই ক্রোধ যা অগ্নির মত অতৃপ্ত, অর্থাৎ ভোগের দ্বারা এর কখনো তৃপ্তি হয় না ও অত্যন্ত পাপকারক। একেই তুমি জগতে সবচেয়ে বড় শত্রু বলে জানবে।'' অনিয়ন্ত্রিত কামনা ও ক্রোধ কিভাবে আমাদেরকে নৈতিক

ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় তা এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

''প্রথমে একটি সুন্দর মূর্তির আবির্ভাব হয়। মনের প্রবণতা হল এই দৃশ্যকে বারবার দেখা। রূপ-রসাদি ভাবতে ভাবতে কোন জিনিষটা প্রথমে মানুষের মনে ভাল লাগে ও মন সেদিকে ঢলে পড়ে। অমনি কামের উদয় হয় অর্থাৎ এটা আমার হোক, এইরকম ইচ্ছা হয়ে সেইটাকে ধরতে এগিয়ে যায়। তাতে বাধা পেলেই বিরক্ত আসে। বিরক্তির পরিণাম ক্রোধ, তার বশীভূত হয়ে সে সেই বাধাটা দূর করতে চেষ্টা করে। তার পরিণামে মোহ আসে। মোহ এলে 'সত্যপথে চলব, ধর্মপথে থাকব' ইত্যাদি উচ্চ উদ্দেশ্যগুলি ভুলে যায়। এরই নাম স্মৃতির লোপ হওয়া। তখন ন্যায়ে হোক বা অন্যায়ে হোক যে জিনিষটা মানুষ লাভ করতে ছোটে। গুরু উপদেশ প্রভৃতি এতদিন যা তাকে মন্দ কাজ, পাপ কাজ থেকে বিরত রেখেছিল, সে সব ভুলে যায়। ফলে বুদ্ধি গুলিয়ে যায় ও পাপ কাজ করে অশেষ প্রকারে কষ্ট পায়।'' (*ভগবদ্গীতা* ২ঃ২৬-৬৩) *(গীতাতত্ত্ব স্বামী সারদানন্দ, পৃঃ ৫৬)*। সুতরাং কামনা ও ক্রোধের নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে ত্যাগ ও সেবার কোন সার্থক অনুশীলন সম্ভব নয়।

৩.৩.১ বাধ্যতামূলক নৈতিক ব্রত

এই ধরণের নিয়ন্ত্রণের জন্য দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন। এই ইচ্ছাশক্তি ও মনের পবিত্রতার অধিকারী হওয়ার জন্য প্রাচীনকাল থেকে আমাদের সমাজ কিছু নির্দিষ্ট নৈতিক মূল্যবোধ বাধ্যতামূলক চর্চার নির্দেশ দিয়েছে। এই মূল্যবোধগুলি স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। অতীতে মহর্ষি মনু, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, মহর্ষি পতঞ্জলি ও আধুনিক ভারতের স্মৃতিশাস্ত্র আমাদের সংবিধানে যে সদ্গুণগুলির নির্দেশ দিয়েছেন তার একটি তুলনামূলক ধারণার জন্য নীচের তালিকাটি দেওয়া হল।

মহর্ষি মনু	মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য	মহর্ষি পতঞ্জলি	ভারতের সংবিধান
সত্যনিষ্ঠা	সত্যনিষ্ঠা	সত্যনিষ্ঠা	ন্যায়
চুরি না করা	চুরি না করা	ক্ষতি না করা	সমতা
পরিচ্ছন্নতা	পরিচ্ছন্নতা	অর্থলোলুপ না হওয়া	স্বাধীনতা
ক্ষমা	আত্মসংযম	ব্রহ্মচর্য্য	ভ্রাতৃত্ব
সাহস	দান	(অপরিগ্রহ)	
জ্ঞান	সহ্যশক্তি	পবিত্রতা	
প্রজ্ঞা	দয়া	সন্তুষ্টি	
ক্রোধের নিয়ন্ত্রণ		আত্মনিয়ন্ত্রণ	
		অধ্যয়ন	
		ঈশ্বর কেন্দ্রিকতা	

নৈতিক মূল্যবোধ চর্চার এই দীর্ঘ তালিকা দেখে হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। এই মূল্যবোধগুলিকে এক একটি করে অর্জন করার চেষ্টার কোন প্রয়োজন নেই। বাস্তবিক যদি আপনি সত্যনিষ্ঠা ও আত্মসংযম এই দুটি সদ্‌গুণ আয়ত্ত করার দিকে জোর দেন তাহলে বাকী গুণগুলি স্বাভাবিকভাবেই আপনার আয়ত্তে এসে যাবে।

৩.৩.২ সত্যনিষ্ঠ হওয়া

আমাদের শাস্ত্রে জোর দিয়ে এইকথা বলা হয়েছে যে শেষ পর্যন্ত একমাত্র সত্যেরই জয় হয়। আমাদের জাতীয় আদর্শ 'সত্যমেব জয়তে' এই সত্যের কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব মা কালীর কাছে শুদ্ধাভক্তির প্রার্থনা জানিয়ে নিজের জীবনের সর্ব দ্বৈতকে মার পায়ে উৎসর্গ করেন—জ্ঞান ও অজ্ঞান, শুচি ও অশুচি, ভাল ও মন্দ এবং ধর্ম ও অধর্ম।

কিন্তু সত্যকে তিনি ত্যাগ করতে পারেননি কারণ তাহলে তাঁর ত্যাগই

যে মিথ্যা হয়ে যাবে!

সত্যনিষ্ঠা বা সততা অন্য সব সদ্‌গুণের ভিত্তি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বারবার বলেছেন ঃ ''এমনকি যারা নানারকমের জাগতিক কাজে যেমন ব্যবসায়ে, অফিসের কাজ ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকে তাদেরও সত্যতে থাকা উচিত। সত্য কথাই কলির একমাত্র তপস্যা।'' *(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত)*

যদি কেউ অন্যের সাথে মিথ্যা আচরণ করে তবে তার উপর লোক আস্থা হারিয়ে ফেলে। বিশ্বাস হারানোর অর্থ সবকিছু হারানো। আবার অন্যদিকে মিথ্যা বললে তার আত্মমর্যাদার হানি হয়। আর আত্মসম্মানবোধ না থাকলে সে ব্যক্তি সমাজেরও সম্মান হারায়। সত্যনিষ্ঠা জাত শক্তিই মানুষকে ভয়, অপরাধবোধ এবং দ্বিচারিতা ইত্যাদি থেকে মুক্তি দিতে পারে। যে ব্যক্তি এই সদ্‌গুণের অধিকারী হন তাকেই সত্যবাদী বলা হয়।

৩.৩.৩ আত্মনিয়ন্ত্রণের অভ্যাস করা

অন্যের সেবায় নিয়োজিত হতে হলে আমাদেরকে স্বার্থপরতা, অহংকার ও আরামপ্রিয়তা ইত্যাদি বর্জন করতে হবে এবং এই ত্যাগের জন্য প্রচুর মানসিক ও শারীরিক শক্তির প্রয়োজন। অপ্রয়োজনীয় বাক্যালাপ, অতিভোজন ও কামনাকে প্রশ্রয় দিলে যে কর্মশক্তির ক্ষয় হয় তা আত্মসংযমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে প্রয়োজনীয় কর্মশক্তি গড়ে ওঠে। বাস্তবিক, আত্মসংযমই অন্য সদ্‌গুণগুলির জন্ম দেয় এবং যে ব্যক্তির মধ্যে এই আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা জন্মায় তাকে জিতেন্দ্রিয় বলা হয়।

ক প্রার্থনা

৩.৪ বিশ্বজনীন প্রার্থনা

অন্যের প্রতি সহৃদয়তা এবং ভালোবাসা বাড়ানোর একটি প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে 'প্রার্থনা'। এইরকম বিশ্বজনীন প্রার্থনা আমরা রোজ অন্যের মঙ্গলকামনায়, বিশেষ করে যাদের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক নেই তাদের

জন্য আবৃত্তি করতে পারি।

''সর্বস্তরতু দুর্গাণি সর্বো ভদ্রাণি পশ্যতু।

সর্বঃ সদ্‌বুদ্ধিমাপ্নোতু সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু।।''

সবাই যেন বিপদ থেকে মুক্ত হয়। সবার যেন যা শুভ তার উপলব্ধি হয়। সবার মধ্যে যেন মহৎ চিন্তা জাগরূক হয়। সবাই সর্বত্র যেন আনন্দে থাকে।

'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ

সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ ভবেৎ।।''

সবাই যেন সুখী হয়। সবাই যেন রোগমুক্ত হয়। সবাই যেন সব কিছু শুভ দেখে। কেউ যেন দুঃখ না পায়।

'দুর্জনঃ সজ্জনো ভূয়াৎ সজ্জনঃ শান্তিমাপ্নুয়াৎ।

শান্তো মুচ্যেৎ বন্ধেভ্যো মুক্তাশ্চান্যান বিমোচয়েৎ।।''

দুষ্ট লোক যেন গুণবান্ হয়। গুণবানরা যেন স্থিরতা পায়। স্থির ব্যক্তিরা যেন বন্ধনমুক্ত হয়। বন্ধনমুক্তরা যেন অন্যদের বন্ধনমুক্ত করে।

এই প্রার্থনাগুলির সাথে সাথে অন্যের দোষ না দেখার মহৎ অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। মা সারদাদেবীর শেষ বাণী ছিল ঃ

''যদি শান্তি চাও মা, কারো দোষ দেখো না।
দোষ দেখবে নিজের, জগতকে আপনার করে নিতে শেখো।
কেউ পর নয় মা, জগত তোমার।''

খ 'কর্মযোগ'-এর রহস্য অবগত হওয়া

৩.৫ নিঃস্বার্থ কাজ করার কৌশল

ভগবদ্‌গীতায় নিষ্কাম কর্মের একাধিক কৌশলের কথা বলা আছে। তার মধ্যে একটি কৌশল হল কাজের উৎকর্ষতা। আপনি যখন কোন কাজ হাতে নেবেন তখন সেটিকে সুচারুরূপে অনুষ্ঠান করাটাই যেন আপনার

ধ্যান জ্ঞান হয়ে ওঠে। এইরকম উৎসর্গীকৃত প্রাণে কাজ করলে মনের বিক্ষেপ ক্রমশ অপসারিত হয় আর কর্মোদ্দেশ্যটি বিশুদ্ধ হয়।

এইভাবে সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত কর্ম তখন হয়ে ওঠে সমাজের সেবা। আবার এই ধরণের কাজ হয়ে ওঠে আনন্দের উৎস।

যারা ভগবানে বিশ্বাস করেন তাদের পক্ষে আসক্তি ত্যাগ করার একটি সহজ পথ আছে। তা হল সমস্ত কর্মের ফল ভগবানকে অর্পণ করা। নিজেকে ভগবানের সেবক ভেবে তাঁকে খুশী করার জন্য কাজ করে যাওয়া। ভগবানই আপনাকে আপনার পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও সমাজের পবিত্র দায়িত্বের ভার দিয়েছেন। এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে থাকলে তা ক্রমশঃ আত্মোৎসর্গে পরিণত হয়।

যদি আপনি ভগবান বা বাইরের কোন শক্তিতে বিশ্বাস না করেন তাহলে আপনার নিজের মানসিক শক্তি ও বিচারশক্তির দ্বারা এই অনাসক্তি আয়ত্ত করতে হবে এবং মনে মনে বলতে হবে ''আমায় অনাসক্ত হয়ে থাকতেই হবে।''

[গ] নীতিপূর্ণ সামাজিক আদান প্রদান

৩.৬ লোকের সাথে মিশবার কৌশল ঃ

সেবার আদর্শ কার্যকরী করতে হলে আপনাকে জানতে হবে কিভাবে নীতির সাথে আপোস না করে লোকের সাথে মিশতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ তাঁর ছাত্রদের উপদেশ দিতেন ''মতামতের ব্যাপারে নদীর স্রোতের অনুকূলে সাঁতার দেবে, কিন্তু নীতির ব্যাপারে শিলার মত দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।'' বাস্তবিক, 'নৈতিকতাই' জীবনের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। এই নৈতিক সদ্‌গুণগুলি হল সত্যনিষ্ঠা, পবিত্রতা, দান, স্বার্থশূন্যতা, সহ্যশক্তি এবং আত্মশৃঙ্খলা। অপরপক্ষে, মতামতের বিষয়গুলি জীবনে মোটেই অত্যাবশ্যক নয়।

(যেমন, কোন রাজনৈতিক দল ভালভাবে সরকার চালাতে পারবে, কে সিনেমার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ইত্যাদি।)

এখন প্রশ্ন হলো, দৈনন্দিন জীবনে আপনার সাথে যে নানা ধরণের মানুষের দেখা হয় তাদের সাথে মিশবার সময় কিভাবে আপনি মানসিক স্থৈর্য্য বজায় রাখবেন? এই ধরণের ব্যবহারের সময় কি রকম মনোভাব রাখা উচিত সে সম্বন্ধে পাতঞ্জল যোগের একটি সূত্র ব্যাখ্যা করে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ

'' আমাদের সকলের প্রতি বন্ধুত্ব রাখা, দীনজনের প্রতি দয়াবান হওয়া, লোককে সৎকর্ম করিতে দেখিলে সুখী হওয়া এবং অসৎ ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা আবশ্যক। এইরূপ বিষয়গুলি যখন আমাদের সম্মুখে আসে, তখন সেইগুলির প্রতিও আমাদের ঐ রূপ ভাব ধারণ করা আবশ্যক। যদি বিষয়টি সুখকর হয়, তবে উহার প্রতি 'মৈত্রী' অর্থাৎ অনুকূল ভাব ধারণ করা আবশ্যক। এইরূপে যদি কোন দুঃখকর ঘটনা আমাদের চিন্তার বিষয় হয়, তবে যেন আমাদের অন্তঃকরণ উহার প্রতি 'করুণা' ভাবাপন্ন হয়। যদি উহা কোন শুভ বিষয় হয়, তবে আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। আর অসৎ বিষয় হইলে সেই বিষয়ে উদাসীন থাকাই শ্রেয়ঃ। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রতি মনের এই-সকলভাব আসিলে মন শান্ত হইয়া যাইবে।" (বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৫১)

ধ্বংসাত্মক আবেগগুলিকে কিভাবে ব্যবহারিক জগতে গঠনমুখী করানো যায় তা বিশদ ব্যাখ্যা করে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ

''উদাহরণস্বরূপ, যদি আমাদের মনে ক্রোধের ভাব জাগে তাকে আমরা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করব? মনে আর একটি সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব তৈরী করে। অর্থাৎ ভালবাসার কথা চিন্তা করে। কোন সময় একজন মা হয়ত তাঁর স্বামী ওপর রেগে আছেন, মনের সেই অবস্থায় যদি তার শিশু সন্তানটি তাঁর কাছে আসে, তখন তিনি তাকে কোলে তুলে নেবেন। সাথেসাথে মনের সেই ক্রোধের ভাবটি অপসৃত হবে ও সন্তানের প্রতি ভালবাসায় তাঁর মন ভরে উঠবে। একইভাবে, অন্তরে চৌর্যের ভাব এলে অচৌর্যের চিন্তা করতে হবে। দান

গ্রহণ করার ইচ্ছা হলে, তার বিপরীত চিন্তা করতে হবে।"

৩.৭ ন্যায়ের পথে থেকে উন্নতি ঃ

আমাদের বর্তমান সমাজে ত্যাগ ও সেবার এই দুই আদর্শের অনুসরণ অপ্রয়োজনীয় ও বাস্তবতা বিরোধী মনে হতে পারে। কিন্তু আমাদের কর্তব্য মহর্ষি ব্যাসদেবের এই কথাগুলি মনে রাখা, ''ধর্মের পথে চললে অর্থ ও বাসনার বস্তু অর্জন করা যায়।'' *(মহাভারত১৮ঃ৫ঃ৪৯)*। ধর্ম বলতে এখানে ন্যায়ের পথের কথা বলা হয়েছে যা এক সার্বজনীন সত্য।

বাবা-মা অথবা শিক্ষক হিসাবে এই ত্যাগ ও সেবার আদর্শকে আপনাদের নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করে দেখাতে হবে। তবেই আপনারা আপনাদের সন্তান এবং ছাত্রদের চরিত্র গঠনে নীরব অথচ নিশ্চিত প্রভাব ফেলতে পারবেন।

অধ্যায় ৪ চরিত্র গঠন

চরিত্র গঠনের প্রাথমিক পর্যায় শুরু হয় বাড়ীতে। এই প্রসঙ্গে অভিভাবক হিসেবে স্বভাবতই আপনাদের কিছু মৌলিক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। যেমন—

ক) কখন সন্তানদের চরিত্র গড়ার কাজ আরম্ভ করতে হবে?

খ) সন্তানকে ঠিকভাবে বড় করে তোলার জন্য আদর্শ মনোভাবটি কি হওয়া উচিত?

গ) চরিত্রগঠনের প্রেক্ষিতে কোন্ অভ্যাসগুলি আপনার সন্তান বাড়ীতে আয়ত্ত করবে?

।। ক ।। চরিত্র গঠন করার কাজ কখন আরম্ভ করতে হবে?

৪ জীবনের পরিবর্তনের ছয়টি ধাপ

একটি শিশুর বড় হয়ে ওঠার বিভিন্ন ধাপগুলি বুঝতে পারলে তার চরিত্র গড়ে তোলার কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। মানুষ তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ছয়রকমের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। সেগুলি হল—

১. গর্ভাবস্থা

২. গর্ভ থেকে বাইরের পৃথিবীতে বেরিয়ে আসা

৩. পারিপার্শ্বিক থেকে বাতাস, জল ও খাদ্য নিয়ে বেড়ে ওঠা।

৪. এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় যাওয়া—শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠা ইত্যাদি।

৫. বার্দ্ধক্যে প্রবেশ

৬. বিনাশ বা মৃত্যু

এই পরিবর্তনের ধারার মধ্যে শরীর ও মনকে প্রভাবিত করার উপযুক্ত সময় হল গর্ভাবস্থা থেকে আঠারো বছর বয়স।

শৈশবে জন্ম থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত পৃথিবীটা একটি খেলাঘরের মত মনে হয়। শিশুরা কোন সামাজিক অনুমোদনের তোয়াক্কা না করে তাদের মনের সহজাত প্রবৃত্তির তৎক্ষণাৎ তৃপ্তির চেষ্টা করে।

শিশু যখন ধীরে ধীরে বালক হতে থাকে (পাঁচ থেকে বারো বছর পর্যন্ত) তখন তার বাস্তব জীবনের সাথে পরিচিতি হতে থাকে। এই সময়েই শিশুদের মনে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক সংস্কারের ছাপ পড়ে (ঠিক যেমন করে ব্লটিং কাগজ -blotting paper- কালি শুষে নেয়)।

বালক বয়স থেকে কৈশোরে (বারো থেকে আঠারো বছর বয়স) জ্ঞান হওয়ার পর্যায়ে একটি লক্ষণীয় পরিবর্তন আসে। এই সময়ের কিছু উল্লেখযোগ্য চারিত্রিক পরিবর্তন হলো অনিয়ন্ত্রিত আবেগ, সহনশীলতার অভাব ইত্যাদি।

কৈশোর থেকে প্রাপ্তবয়স্ক (আঠারো বছরের বেশী) হয়ে ওঠার সময় তাদের পৃথিবী ও নিজের সম্বন্ধে কিছু স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে।

বাস্তবিক, আপনার সন্তানের চরিত্র গঠনের কাজ তার জন্মের আগের থেকেই আরম্ভ করা প্রয়োজন।

৪.১ চরিত্র গঠন জন্মের আগেই আরম্ভ হয়

আমাদের শাস্ত্রে বলা হয় যে একজন শিশু মার গর্ভে থাকার সময় থেকেই জ্ঞান ও সংস্কার অর্জন করতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে, মহাভারতের অর্জুন ও সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যু একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। একদিন সুভদ্রার উপস্থিতিতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কিছু গোপন যুদ্ধপ্রণালী শিক্ষা দিচ্ছিলেন। অভিমন্যু তখন তার মায়ের গর্ভে এবং সেই অবস্থাতেই তিনি এই যুদ্ধ প্রণালী আয়ত্ত করে ফেলেন। পরে

অভিমন্যু এই অর্জিত বিদ্যার দ্বারাই মহাভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে লড়াই করে পাণ্ডবদের সম্মান বাঁচান। মহর্ষি অষ্টাবক্র ও ভক্ত প্রহ্লাদের গল্পেও মায়ের গর্ভে থাকার সময় তাঁদের মনের উপর প্রভাব পড়ার উদাহরণ আমরা পাই।

আধুনিক শব্দ চিকিৎসায় এটি একটি প্রমাণিত সত্য যে সঙ্গীত মাতৃগর্ভে থাকা সন্তানের ও জন্মের পরে তাদের মানসিক আবেগের উপর খুব উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। দেখা গেছে, যখন গর্ভবতী মায়েরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বাজনা শুনছিলেন তখন তাদের গর্ভের শিশুরা প্রশান্ত অবস্থায় ছিল। আবার মায়েরা যখন উচ্চস্বরের রক সঙ্গীত (rock music) শুনছিলেন, তখন একই সন্তান খুব বিরক্ত হয়ে তীব্রভাবে পেটের ভিতর লাথি মারছিল।

জন্মের আগে সন্তানের উপর মায়ের প্রভাব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ

''আমি জানি আমার জন্ম হওয়ার আগে থেকে আমার মা উপোস, প্রার্থনা এবং ব্রত ইত্যাদি শত শত জিনিস করতেন যা আমি এমনকি পাঁচ মিনিটের জন্যও করতে সমর্থ নই। তিনি দুবছর ধরে এইসব করেছিলেন। আমি বিশ্বাস করি যে আমার মধ্যে যে ধর্মীয় ভাব এসেছে তা আমার মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছি। আমার মা খুব সচেতনভাবে, বড় হয়ে আমি কিরকম হব তা ঠিক করে, আমাকে পৃথিবীতে এনেছিলেন। আমার মধ্যে যা কিছু শুদ্ধ ভাব আছে তা আমার মাই আমাকে দিয়েছেন—সচেতনভাবে, অচেতনভাবে নয়।''

সুতরাং একটি শিশুর জন্ম হওয়া উচিত ধর্ম ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে। হিন্দু শাস্ত্রে সুখী জীবনের জন্য যে দশটি সংস্কারের নির্দেশ আছে তার মধ্যে তিনটি হল ভাবী বাবা-মার জন্য। সুতরাং বাবা-মা হওয়ার প্রস্তুতি শুধু সন্তানের রোজকার প্রয়োজনীয় ছোটখাট জিনিস যোগাড় করা নয়--অনেক বেশী জরুরী শুদ্ধ চিন্তার অভ্যাস করা। এর ফলে শিশুর

ঠিকমত সংস্কার গড়ে উঠবে। পরিবারের সমস্ত সদস্যের ও বিশেষ করে ভাবী মায়ের এগুলি নৈতিক দায়িত্ব।

সেইজন্য একজন গর্ভবতী মায়ের উচিত ঃ

ক) সবসময় হাসি-খুশী ও শান্তির মেজাজে থাকা

খ) সুষম ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়া এবং যথেষ্ট বিশ্রাম নেওয়া

গ) প্রার্থনা, পূজা ও ভাল বই পড়ার মধ্য দিয়ে নিজেকে ভাল চিন্তায় নিমগ্ন রাখা এবং

ঘ) মূল্যবোধের শিক্ষার মধ্য দিয়ে নিজের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক উন্নতির চেষ্টা করা।

৪.২ চরিত্র গড়ার দুটি প্রাথমিক হাতিয়ার—ঘুমপাড়ানির গান ও নীতি গল্প

শিশুর জন্ম হওয়ার পর তাকে দোলনায় দোলাবার সময় যে ঘুমপাড়ানি গান গাওয়া হয় তার মধ্যে দিয়ে মা শিশুর উপর সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আধুনিক সমাজে এই সনাতন ধারা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই 'মা-শিক্ষকের' একটি অসাধারণ গল্প রয়েছে মার্কণ্ডেয় পুরাণে। এই গল্পটি রাণী মদালসার—তাঁর চার সন্তানের উপর প্রভাব নিয়ে। যখনই তাঁর প্রথম সন্তান কেঁদে উঠত রাণী তাকে সান্ত্বনা দিতেন বেদান্তের সর্বোচ্চ সত্যগুলি গান গেয়ে শুনিয়ে—''তোমার কোন নাম নেই, তুমি শুদ্ধ আত্মা...এই পঞ্চভূতে গড়া শরীর তুমি নও, তবে কিসের জন্য তুমি কাঁদছ? এ তুমি নও, রাজপুত্র ইত্যাদি নানা কল্পিত গুণের সমন্বয়ে গঠিত যে মিথ্যে অহং, সে কাঁদছে।'' পরে এই প্রথম সন্তান যৌবনে নানা শাস্ত্র পড়ে আরো প্রজ্ঞাবান হয়ে ওঠেন। এইভাবে মানুষ হওয়ায় তার সংসারে কোন আকর্ষণ জন্মায় নি ও সব ত্যাগ করে তিনি চলে যান। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছেলেকেও রাণী একইভাবে বড় করায় তাঁরাও তাঁদের বড় দাদার পথ অনুসরণ করেন। তারপরে রাজত্বের একজন মহৎ উত্তরাধিকারী রেখে যাওয়ার জন্য রাণী

তাদের চতুর্থ পুত্র অলর্ককে আদর্শ রাজার স্বভাব ও কর্তব্য সম্পর্কিত ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে শোনাতেন। তিনি গাইতেন ''তুমি প্রবল ক্ষমতাবান, তোমার শরীরে ও মনে অনেক শক্তি, তোমার জন্ম হয়েছে তোমার প্রজাদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করার জন্য।'' এইভাবে শেখানোর ফলে, এই চতুর্থ ছেলে একজন আদর্শ কর্মযোগী ও ন্যায়পরায়ণ রাজা হয়ে উঠেছিলেন।

সন্তান যখন একটু বড় হয়ে বাড়ীর মধ্যে ঘোরাঘুরি শুরু করে, তখন মা রোজকার ঘরের কাজ করার সময় স্তোত্র আবৃত্তি এবং দেশভক্তির ও ধর্মীয় গান করতে পারেন।

সন্তান কথা বলতে শেখার পর, চরিত্র গঠনের অন্যতম প্রধান উপায় হল তাকে গল্প শোনানো। স্বামী বিবেকানন্দের মা ভুবনেশ্বরী দেবী নরেন্দ্রনাথকে মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণের গল্প শোনানোর ফলেই নরেন্দ্রনাথ তাঁর দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন। তার মা তাকে নীতিবোধের নিয়মগুলিও শিখিয়েছিলেন ''সারাজীবন পবিত্র থাকবে, নিজের মর্যাদাকে সব সময়ে রক্ষা করবে এবং অন্যের সম্মান কখনো ক্ষুণ্ণ করবে না। খুব শান্ত হয়ে থাকবে, কিন্তু যখন দরকার তোমার হৃদয়কে কঠোর করবে।''

পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ গর্বের সাথে বলতেন, 'আমার জ্ঞানের স্ফুরণের জন্য আমি আমার মার কাছে চিরঋণী।'' স্বভাবতই, চরিত্র গড়ার এই দুটি হাতিয়ার—ঘুমপাড়ানি গান ও গল্প শোনানো—ব্যবহার করতে হলে মা-বাবাকে প্রথমে এগুলি শিখতে হবে।

।। খ ।। সন্তান মানুষ করার জন্য আপনার আদর্শ মনোভাব

৪.৩ শিশু নিজেই নিজেকে শেখায়

সবসময়ে মনে রাখবেন যে আপনার সন্তান তার আগের জন্মের সঞ্চিত কর্ম নিয়ে জন্মেছে ও প্রধানত তার থেকেই ঠিক হবে যে সে বড় হয়ে

কিরকম হবে। বাস্তবিক আপনি যেভাবে তাকে সাহায্য করতে পারেন সেগুলি হলো—

ক) একটি আদর্শ জীবন যাপনের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া।

খ) তার নৈতিক বিকাশের উপযুক্ত একটি সুষ্ঠু বাহ্যিক পরিবেশ সৃষ্টি করা।

স্বামী বিবেকানন্দ এই বিষয়ে একটি সুন্দর উপমা দিয়েছেন ঃ ''আপনারা একটি গাছকে উহার পক্ষে অনুপযোগী মৃত্তিকার উপর বসাইয়া কখন বড় করিতে পারেন না। যেদিন আপনারা শূন্যের উপর বা প্রতিকূল মৃত্তিকায় গাছ জন্মাইতে সক্ষম হইবেন, সেইদিন আপনারা একটি ছেলের প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া জোর করিয়া তাহাকে আপনাদের ভাব শিখাইতে পারিবেন।

শিশু নিজে নিজেই শিখিয়া থাকে। তবে তাহাকে তাহার নিজের ভাবে উন্নতি করিতে আপনারা সাহায্য করিতে পারেন। সাক্ষাৎভাবে কিছু দিয়া আপনারা তাহাকে সাহায্য করিতে পারেন না, তাহার উন্নতির বিঘ্নগুলি দূর করিয়া পরোক্ষভাবে সাহায্য করিতে পারেন। নিজস্ব নিয়মানুসারেই জ্ঞান তাহার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। মাটিটা একটু খুঁড়িয়া দিন, যাহাতে অঙ্কুর সহজে বাহির হইতে পারে; চারিদিকে বেড়া দিয়া দিতে পারেন, যেন কোন জীব জন্তু চারাটি না খাইয়া ফেলে; এইটুকু দেখিতে পারেন যে, অতিরিক্ত হিমে বা বর্ষায় যেন উহা একেবারে নষ্ট হইয়া না যায়— ব্যাস আপনার কাজ ঐখানেই শেষ। উহার বেশী আপনি আর কিছু করিতে পারেন না। বাকীটুকু অন্তর্নিহিত প্রকৃতির বহির্বিকাশ। শিশুর শিক্ষা সম্বন্ধেও এইরূপ। শিশু নিজে নিজেই শিক্ষা পায়।'' (বাণী ও রচনা, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১১৯-১২০, সপ্তদশ সংস্করণ)

৪.৩.১ একটি পবিত্র দায়িত্ব

আপনার সন্তান ভগবানের কাছ থেকে পাওয়া এক মহামূল্যবান

উপহার। সে যাতে ঠিকভাবে বড় হতে পারে তা দেখা আপনার এক পবিত্র দায়িত্ব। সুতরাং তাদের ওপর অধিকার বিস্তার করা এবং তাদের কাছ থেকে প্রতিদানের প্রত্যাশা উভয়ই অযৌক্তিক।

৪.৩.২ সুদীর্ঘ সময় ও কষ্টসাধ্য কাজ

আপনার সন্তানের চরিত্র গড়ার কাজ অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হবে না। এই কাজ করতে অনেক সময় লাগবে ও প্রায়ই আপনাদের ব্যর্থতার মুখোমুখি হতে হবে। স্বামীজী বলছেন—''ভালোর দিকে যাবার পথটি সবচেয়ে দুর্গম ও বন্ধুর। এটাই আশ্চর্যের কথা যে, এত লোক সফল হয়; অনেকে যে পড়ে যায়, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। সহস্র পদস্খলনের ভেতর দিয়েই চরিত্র গড়ে তুলতে হবে।" (পত্রাবলী, পৃঃ ৪৭৭, একাদশ সংস্করণ)

কাজেই চরিত্র গঠনের জন্য অসীম ধৈর্য্য ও তীব্র অধ্যবসায় লাগে। যদি আপনার সন্তান বয়ঃসন্ধিকালের (teenage) হয় তাহলে তাকে খুব সহানুভূতির সাথে বোঝার দরকার কারণ সে জীবনের এক কঠিন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

৪.৩.৩ সন্তানকে আপনার স্বপ্নের মধ্যে বন্দী করে রাখবেন না

আপনার নিজের পছন্দ বা উচ্চাকাঙ্খা সন্তানের উপর জোর করে চাপিয়ে দিলে তাদের মানসিক চাপ বেড়ে যেতে পারে। তাদের যে বিষয়ে সহজাত আগ্রহ তা আবিষ্কার করে সেগুলির বিকাশে সাহায্য করাই হল ঠিক পন্থা। আপনার নিজের মতামত ও ধারণা সন্তানের উপরে চাপানোর অতিরিক্ত চেষ্টা করলে তার সৃজনী ক্ষমতা হারিয়ে যাবে।

গ চরিত্র গঠনের জন্য আপনার অবলম্বনীয় পদ্ধতি

৪.৪ আপনার সন্তানকে কি কি মূল্যবোধ শেখাতে চান ?

সন্তানের নৈতিক ও আত্মিক বিকাশের জন্য কি কি মূল্যবোধ দরকারী সে সম্পর্কে যদি আপনার কোন স্পষ্ট ধারণা না থাকে, তাহলে অভ্যাসগুলি এলোমেলো ভাবে হবে ও সেগুলি ফলপ্রসূ হবে না। তার ফলে আপনার সন্তান দিশাহারা ও হতাশ হয়ে পড়বে। সুতরাং মূল নীতিগুলির উপর জোর দিন। প্রধান বিষয় যেগুলির সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হবে তা হল— স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও নৈতিকতা।

৪.৪.১ আপনার জীবনের মূল্যবোধগুলি আপনার সন্তানকে জানতে দিন

আপনি নিজে যে মূল্যবোধগুলি অনুসরণ করেন এবং সেগুলি কেন আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ তা আপনার সন্তানদের বোঝা খুবই জরুরী। যেহেতু আপনার সন্তানদের কাছে আপনার মতামত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাই তারা নিজেরাই আপনার মূল্যবোধগুলি তাদের জীবনেও পালন করবে।

৪.৪.৩ রোজকার পরিস্থিতি নিয়ে মূল্যবোধের আলোচনা

প্রাত্যহিক ঘটনা যেমন সংবাদ পত্রের খবর, বাড়ী বা স্কুলের কোন ঘটনা নিয়ে মূল্যবোধের আলোচনা শুরু করা যেতে পারে।

৪.৪.৪ আপনার সন্তানের শিক্ষকদের সাথে নিয়মিত সংযোগ

আপনার সন্তানের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের উপর আপনি ছাড়া আর যাদের জোরালো প্রভাব পড়ে তারা হলেন শিক্ষক। সুতরাং নিয়মিত স্কুলে গিয়ে

শিক্ষকদের সাথে দেখা করে সন্তানের লেখাপড়ার অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করুন। স্কুলের শিক্ষক-অভিভাবকদের মিটিংএ সবসময় যোগ দেবেন। স্কুল সম্বন্ধে আপনার এই আগ্রহ আপনার সন্তানের পড়াশুনার ব্যাপারে তার দায়বদ্ধতা আরো বাড়িয়ে তুলবে। সন্তানের সামনে তার শিক্ষকের সমালোচনা করবেন না। তাহলে শিক্ষকদের সম্বন্ধে তার শ্রদ্ধা চলে যাবে ও তাদের পরীক্ষার ফল খারাপ হলে শিক্ষকদের অক্ষমতার অজুহাত দেবে।

৪.৪.৫ আপনার মূল্যবান সময় আপনার সন্তানকে দিন

আপনার কাজের রুটিনের ফাঁকে আপনার সন্তানের সাথে সৃষ্টিমূলক সময় কাটানোকে যে কোন মূল্যে অগ্রাধিকার দেবেন। আপনি সন্তানকে সাথে নিয়ে কি কি পারিবারিক কাজ করবেন তা ঠিক করুন যেমন, পরিবারের সবাই মিলে একসাথে বসে খাওয়া, পূজা করা, খেলাধূলা করা, বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয় করে জোরে জোরে নাটক পড়া, কোন সেবামূলক কাজে যোগ দেওয়া ও পারিবারিক আনন্দোৎসব করা ইত্যাদি। আপনি সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে লাইব্রেরী, মিউজিয়াম, প্রদর্শনী ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যান। পরিবারের সবাই মিলে এই কাজগুলি করার ফলে সন্তানের সঙ্গে আপনার পারিবারিক বন্ধন ও মূল্যবোধ দৃঢ় হবে।

৪.৪.৬ আপনি কিভাবে কথা বলছেন বা কি কথা বলছেন তা সমান গুরুত্বপূর্ণ

খুব ভাল পরামর্শও যদি ঠিকভাবে না দেওয়া হয় তাহলে তা অপ্রীতিকর বলে মনে হয়। উত্তেজিত ভঙ্গিমায়, বক্তৃতার ঢং-এ অথবা অভিযোগের মনোভাব নিয়ে আপনার ছেলে-মেয়েদের কখনো পরামর্শ দেবেন না। এর ফল হবে তাদের মনে ক্ষোভ ও বিষন্নতার সৃষ্টি করা। ছেলে-মেয়েদের কখনো কটু কথা বলবেন না বা তাদের গায়ে হাত তুলবেন না। আপনি যদি আপনার সন্তানকে সংশোধন করার জন্য উগ্রতার পথ নেন, তাহলে সেও অন্যের সাথে ব্যবহারে এই প্রকার ভাবের প্রকাশ করবে। আর এই

ধরণের স্বভাব নিয়ে যদি আপনার সন্তান বড় হতে থাকে তাহলে বয়ঃসন্ধিকালে সে নিজের ও আপনার জন্য সমস্যা সৃষ্টি করবে।

৪.৪.৭ আপনার সন্তানের দুর্বলদিকগুলি কখনো বড় করে দেখবেন না

একটি শিশুর মনে তার নিজের সম্বন্ধে কিরকম ধারণা গড়ে উঠবে তা নির্ভর করে তার বাবা মা, ভাই-বোন ও বন্ধুরা তাকে কি চোখে দেখে ও তার সাথে কিভাবে ব্যবহার করে তার উপর। যদি তাকে অবহেলা করা হয়, সমালোচনা করা হয় অথবা অপদার্থ বলে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়—তাহলে তার আত্মবিশ্বাস ব্যাহত হবে। সুতরাং সন্তানের ভাল দিকগুলোর উপর সবসময় জোর দেওয়ার কথা মনে রাখবেন। আপনি তার দুর্বল দিকগুলি জানলেও কখনো সেগুলি তার সামনে তুলে ধরবেন না।

৪.৪.৮ সন্তানদের সবসময় প্রশংসা করুন ও উৎসাহ দিন

যখন আপনার সন্তানের ব্যবহারে নিঃস্বার্থপরতা, দয়া, সৌজন্য, সত্যবাদিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলির প্রকাশ পাবে তখন তাকে অকৃত্রিম প্রশংসা করুন। প্রশংসা করলে সে কাজের ক্ষেত্রে বা সদ্‌গুণরাজি বিকাশের ক্ষেত্রে আরো বেশি উৎসাহী ও তৎপর হবে। মনে রাখবেন রামায়ণে জাম্বুবানের উৎসাহবাক্য ও প্রশংসাই বীর হনুমানের জন্মগত শক্তি ও আত্মবিশ্বাসকে জাগিয়ে তুলেছিল। আপনার সন্তান যে কাজেই হাত দিক না কেন কাজটি সে অবশ্যই পারবে—এইভাবে তাকে উৎসাহিত করুন। এর ফলে তার মনোবল বহুগুণ বেড়ে যাবে। আপনার কাছ থেকে পাওয়া এই উৎসাহই তাকে পরবর্তী জীবনে যে কোন কঠিন কাজ সম্পন্ন করতে প্রভূত সাহায্য করবে।

৪.৪.৯ সন্তানকে অন্যের সাথে তুলনা করবেন না

আপনার সন্তানকে তার বন্ধুদের সাথে, এমনকি ভাই-বোনের সাথেও

তুলনা করা বন্ধ করুন। প্রত্যেকটি শিশুরই কিছু নিজস্বতা আছে। তার এই বিশেষ গুণগুলিকে বুঝে নিয়ে সেগুলি বাড়িয়ে তোলার জন্য উৎসাহ দিন।

৪.৪.১০ সন্তানকে দায়িত্ব নিতে দিন

দায়িত্ব পালন করলে শিশুর মধ্যে তার নিজের উপর আস্থা গড়ে ওঠে। খুব কম বয়স থেকেই আপনার সন্তানকে রোজ কিছু কাজের দায়িত্ব দিন—যেমন পূজার জন্য ফুল তোলা, রাতে খাওয়ার জন্য টেবিল সাজানো, বাড়ী/ঘর পরিষ্কার করা, বাড়ীর বাইরে আবর্জনা ফেলা ইত্যাদি। আপনার সন্তানকে তার প্রতিদিনের সমস্যার সমাধান নিজেকেই করতে দিন। আপনি যদি আপনার সন্তানের হয়ে সব সমাধান করে দেন বা সিদ্ধান্ত নেন তাহলে বিভিন্ন বাধার বিরুদ্ধে লড়াই করার তার যে নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে তা প্রকাশ করতে সে ব্যর্থ হবে।

৪.৪.১১ সন্তানকে শাসন করুন

সন্তানকে ঠিকসময়ে ও ঠিকভাবে শাসন করতে পারাই আপনার সত্যিকারের ভালবাসার লক্ষণ। এর ফলে আপনার সন্তান, বিশেষভাবে বয়ঃসন্ধিকালে, আপনার 'লক্ষণরেখার সীমা' স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারবে—অর্থাৎ তারা জানবে যে তাদের কোন্ কোন্ ব্যবহার আপনার অনুমতি পাবে। যখন বন্ধুরা তাকে খারাপ দিকে যাওয়ার জন্য প্ররোচিত করবে তখন সে আপনার অপছন্দ বা আপত্তির দিকটি তুলে ধরে তাদের এড়াতে পারবে। বাস্তবিক, যেখানে নীতির প্রশ্ন জড়িয়ে আছে এবং আপনি নিশ্চিতভাবে জানেন যে আপনার ছেলে-মেয়ে যা করতে চাইছে তাতে তাদের ক্ষতি হবে তখন সুদৃঢ়ভাবে 'না' বলতে শিখুন। তবে আপনার সমালোচনা অবশ্যই গঠনমূলক হবে যাতে তারা উন্নতি করার পথটি সাথে সাথে জানতে পারে। সন্তানকে তার ভুল কাজের পরিণতি থেকে রক্ষা করার চেষ্টা কখনো করবেন না। প্রত্যেক ভুল থেকেই সে মূল্যবান শিক্ষা পাবে যা একটি মহৎ ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য অত্যাবশ্যক।

৪.৪.১২ সন্তানকে বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কের সাথে পরিচিত করান

একটি শিশু সামাজিক মেলামেশার প্রাথমিক শিক্ষা পায় তার বাড়ীতে—কিভাবে অন্যের সাথে ব্যবহার করতে হয়, কিভাবে সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়, কিভাবে মতামত এবং মতের মিল বা অমিল প্রকাশ করা যায় ইত্যাদি। এইজন্য আপনার ও পরিবারের সদস্যদের নিজেদের সম্পর্কের মধ্যে সবসময় শ্রদ্ধা, সৌজন্য, দয়া ও সংবেদনশীলতার প্রকাশ হওয়া অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে, আপনার সন্তানকে অন্যের সাথে মত পার্থক্য সুস্থভাবে কিভাবে মেটাতে হয় তা শেখান।

৪.৪.১৩ সন্তানের কার্যধারা ও তার বন্ধুদের জেনে রাখুন

আপনার সন্তান তার অবসর সময় কোথায়, কাদের সাথে ও কিভাবে কাটায় — সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকুন। অবশ্যই তার কিশোর মনের ভাললাগাগুলির সাথে পরিচিত থাকবেন, কিশোর বন্ধুদের সাথে দেখাসাক্ষাৎ রাখবেন। কেমন টেলিভিশন শো বা কোন ধরনের সিনেমা আপনার সন্তান দেখছে সেদিকে সচেতন থাকুন এবং সিরিয়াল, কার্টুন শো বা পর্দায় খেলা দেখতে গিয়ে তারা যেন তাতেই আসক্ত না হয়ে পড়ে, সে বিষয়ে তাদের সাহায্য করুন।

৪.৪.১৪ সময়ের ঠিকমতো ব্যবহার শেখানো

সময়ের সদ্ব্যবহার করতে না পারার ফলে সবছাত্রের মধ্যে মানসিক চাপ, দুশ্চিন্তা ও ভয়ের সৃষ্টি হয়—বিশেষ করে পরীক্ষার আগে। এইসব বিষয় সংক্রান্ত সমস্যা যাতে না হয় তার জন্য আপনার সন্তানকে সময়ের ঠিকমত ব্যবহার শেখান। আপনার সন্তানকে তার প্রাত্যহিক কাজের মধ্যে কোনটা বেশী ও কোনটা কম জরুরী তা ঠিক করে দিয়ে সপ্তাহের বা মাসের সময় তালিকা (time table) রাখতে সাহায্য করুন ও প্রত্যেক কাজের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে রাখুন। প্রাত্যহিক কাজের পাশাপাশি পড়াশুনা যাতে ভালোভাবে চালিয়ে যেতে পারে তার জন্য সময়ের

পরিকল্পনা খুবই জরুরী। সময়ের পরিকল্পনা না থাকলে খুব বুদ্ধিমান ছাত্রও তার ভিতরের প্রতিভা প্রকাশে ব্যর্থ হবে।

৪.৪.১৫ সমাজসেবার কাজে উৎসাহ দিন

কর্মযোগ বা নিঃস্বার্থ সেবাই মনকে শুদ্ধ করার পথ এবং এইভাবে ইচ্ছাশক্তি ও মনসংযোগের দৃঢ়তা বাড়ে। পরিবারের সদস্যদের, বন্ধুদের ও প্রতিবেশীদের সেবা এবং কোনো সেবাপ্রতিষ্ঠানের কাজের সাথে যোগ দিলে আপনার সন্তানের সামাজিক দায়বদ্ধতা বাড়বে।

।। ঘ ।। চরিত্র গঠনের জন্য শুভ অভ্যাস দৃঢ়মূল করা

একটি শিশুর চরিত্র কেমন হবে তা বেশীরভাগই নির্ভর করে তার সংস্কার বা 'জন্মগত প্রবণতা'র উপর। কিন্তু তাই বলে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে বসে থাকলে হবে না, কারণ একথাও ঠিক যে সচেতনভাবে চেষ্টা করলে সাধারণ সংস্কারকে শুভ সংস্কারে পরিণত করা যায়।

৪.৫ চরিত্র হল নানা অভ্যাসের সমষ্টি

আমাদের প্রতিটি চিন্তা, কথা এবং কাজ আমাদের মনে ছাপ ফেলে। এই ছাপগুলিকেই সংস্কার বলে ও এই সব সংস্কারের সমষ্টিই ঠিক করে দেয় আমাদের আচরণ, জীবনের প্রতি আমাদের মনোভাব, মূল্যবোধ ইত্যাদি—অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে আমাদের চরিত্র। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর রাজযোগের বক্তৃতায় বলেছেন ঃ ''মনকে যদি একটি হ্রদের সাথে তুলনা করা হয় তবে বলা যায় মনের মধ্যে যে-কোন তরঙ্গ উঠে, তাহা প্রশমিত হইলেও একেবারে লুপ্ত হয় না, কিন্তু উহা চিত্তের উপর একটা দাগ রাখিয়া যায় এবং সেই তরঙ্গটির পুনরাবির্ভাব-সম্ভাবনা থাকে। এই দাগ এবং ঐ তরঙ্গের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনার একত্র নাম-'সংস্কার'। মনে এইরূপ অনেক সংস্কার পড়িলে সেগুলি একত্র হইয়া অভ্যাসরূপে পরিণত হয়। 'অভ্যাসই দ্বিতীয় স্বভাব'-এইরূপ কথিত হইয়া থাকে; শুধু দ্বিতীয় স্বভাব নয়, উহা প্রথম স্বভাবও বটে—মানুষের সমুদয় স্বভাবই ঐ অভ্যাসের

উপর নির্ভর করে। আমরা এখন যেরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়াছি, তাহা পূর্ব অভ্যাসের ফল। সমুদয় অভ্যাসের ফল জানিতে পারিলে আমাদের মনে সান্ত্বনা আসে, কারণ যদি আমাদের বর্তমান স্বভাব কেবল অভ্যাসবশেই হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা যখন ইচ্ছা ঐ অভ্যাস দূর করিতেও পারি। অসৎ অভ্যাসের একমাত্র প্রতিকার—তাহার বিপরীত অভ্যাস। যত কিছু অসৎ, অভ্যাস আমাদের চিত্তে সংস্কাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে, কেবল সৎ অভ্যাসের দ্বারা সেগুলি নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। কেবল সৎকার্য করিয়া যাও, অবিরতভাবে পবিত্র চিন্তা কর; অসৎ সংস্কার নিবারণের ইহাই একমাত্র উপায়। কখনও বলিও না, অমুকের আর কোন আশা নাই; কারণ অসৎ ব্যক্তি কেবল একটি বিশেষ প্রকারের চরিত্রের পরিচয় দিতেছে। চরিত্র কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র, নূতন ও সৎ অভ্যাসের দ্বারা ঐগুলিকে দূর করা যাইতে পারে। চরিত্র কেবল পুনঃপুনঃ অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র। পুনঃপুনঃ অভ্যাসই চরিত্র সংশোধন করিতে পারে।" (বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬০)

আপনার সন্তানের চরিত্র গড়ার মূল উপায় এই সত্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে ঃ ''চরিত্র হল অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি ও অভ্যাসের পুনরাবৃত্তির দ্বারাই চরিত্র সংশোধন করা যায়।" আপনার সন্তানকে যেসব ভাল অভ্যাস আয়ত্ত করতে হবে তার মধ্যে কয়েকটি নীচে আলোচনা করা হল। এগুলি তারা কতটা আত্মীকরণ করতে পারবে তা নির্ভর করছে তাদেরকে ক্রমাগত উৎসাহ দেওয়ার উপর এবং অবশ্যই আপনি নিজে কতটা এই অভ্যাসগুলি আয়ত্ত করেছেন—তার উপর।

৪.৫.১ সত্যনিষ্ঠ হওয়া ঃ

সত্য কথা বলার অভ্যাসের মধ্য দিয়েই আমরা সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নৈতিক বল পাই। সুতরাং আপনার সন্তানকে উৎসাহ দিন যাতে সে নিম্নোক্ত আচরণগুলি নিষ্ঠা সহকারে পালন করে—

ক) কোথাও যাওয়া বা কারুর সাথে দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিলে তা রাখা।

খ) কোন কাজের ভার নিয়ে তা সম্পন্ন না করার সঠিক কারণটি বলা।

গ) নিজের দোষ কোন মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে স্বীকার করা।

ঘ) যান বাহনে চলার সময় আবশ্যিকভাবে টিকিট কাটা।

৪.৫.২ দৈনন্দিন রুটিন

একটি দৈনিক রুটিন নিষ্ঠা সহকারে পালন করলে তাতে সময় বাঁচে, শক্তির অপচয় হয় না ও কাজের দক্ষতা বাড়ে। আপনার সন্তানকে সাথে নিয়ে তার দৈনন্দিন কাজগুলির একটা রুটিন তৈরী করুন এবং তাকে নিম্নলিখিত কাজগুলি রোজ একটি নির্দিষ্ট সময়ে করতে উৎসাহিত করুন—

ক) সূর্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে ওঠা

খ) প্রার্থনা করা

গ) ব্যায়াম করা

ঘ) ঠিক সময়ে খাবার খাওয়া

ঙ) নিয়মিত পড়াশুনা করা

চ) রাত্রে সঠিক সময়ে ঘুমোতে যাওয়া।

৪.৫.৩ আহার সংযম

আত্মসংযমের একটি বিশেষ অঙ্গ জিহ্বার নিয়ন্ত্রণ। আজকালকার ছেলেমেয়েরা নির্বিচারে নানারকম অস্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে থাকে। এইসব খাবার প্রায়শই নানা শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি করে। আপনার সন্তানকে প্রাকৃতিক খাবারে রুচি আনার জন্য উৎসাহিত করুন। ''আমরা বাঁচার জন্য খাই, খাওয়ার জন্য বাঁচি না'', এই কথাটির সারমর্ম তাদের শেখা উচিত। আপনার সন্তানকে হজম প্রণালী সম্বন্ধে সচেতন করে তুলুন।

৪.৫.৪ মাঝে মাঝে উপোস করা

মাঝে মাঝে উপোস করা শরীর ও মন দুইয়ের জন্যই উপকারী। এর ফলে ইচ্ছাশক্তি বাড়ে এবং পাকস্থলীও প্রয়োজনীয় বিশ্রাম পায়। উপোস করার নিয়ম ঠিকভাবে মানা জরুরী। উপোস চলাকালীন প্রচুর জল খাওয়া ও উপোসের শেষে হাল্কা খাবার খাওয়া ইত্যাদি নিয়মগুলি অবশ্যই মানা দরকার।

৪.৫.৫ নিয়মিত ব্যায়াম করা

সুস্থ জীবনের জন্য নিয়মিত ব্যায়াম করা দরকার। আপনার সন্তানের বয়সের উপযোগী ব্যায়ামের জন্য কোন ব্যায়াম শিক্ষকের পরামর্শ নিন। যোগাসন এমন একটি আদর্শ ব্যায়াম যাতে শরীর ও মন দুইই একসাথে গড়ে ওঠে। আপনার সন্তানকে বসবার ও দাঁড়ানোর সঠিক ভঙ্গি শেখান।

এর ফলে তারা সুস্থ শরীর গড়ে তোলার ব্যাপারে সচেতন হবে।

৪.৫.৬ উদ্দেশ্য স্থির করা

উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট করা থাকলে জীবনের একটি দিশা থাকে। আপনার সন্তানের সাথে তার বর্তমান লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করুন—যেমন আগামী পরীক্ষায় আরো ভাল ফল করা, স্কুলের ক্রিকেট দলে খেলার সুযোগ পাওয়া ইত্যাদি। তাদের জীবনের বৃহত্তর উদ্দেশ্য নিয়েও তাদের সাথে আলোচনা করবেন—যেমন দৃঢ় চরিত্র গঠন করা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সুস্থ দেহ গড়ে তোলা ইত্যাদি। এই লক্ষ্যগুলি পূর্ণ করার জন্য কি করা উচিত অথবা কি না করা উচিত, তা দেখিয়ে দেবেন। এইভাবে উদ্দেশ্য স্থির হলে, আপনার সন্তান সেই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য দায়িত্ববান হয়ে উঠবে।

৪.৫.৭ আত্মসমীক্ষা

পূর্ণতার দিকে ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়ার নামই জীবন। এই যাত্রার একটি প্রধান ধাপ হল ক্রমাগত নিজের চিন্তা ও অনুভূতিগুলিকে পরীক্ষা

ও বিশ্লেষণ করা। বাস্তবিক এছাড়া প্রগতির আর কোন মাপকাঠি নেই। প্রতিরাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার আগে আপনার সন্তানকে অভ্যাস করান সে যেন পাঁচমিনিট বসে সারাদিন ধরে যা যা করেছে, যা যা ভেবেছে এবং যা যা বলেছে সেগুলি বিশ্লেষণ করে এবং পরের দিন আরো ভাল ভাবে কাটানোর প্রতিজ্ঞা করে।

৪.৫.৮ মুখস্থ অভ্যাস করা

আপনার সন্তানকে উৎসাহিত করুন সে যেন কিছু সার্বজনীন প্রার্থনা, সুভাষিত, শাস্ত্রের বাছাই করা কিছু অংশ ও উদ্দীপনাময় কিছু উদ্ধৃতি মুখস্থ করে। এর দ্বারা তার স্মরণশক্তি ও মনসংযোগ বাড়বে। পরে আপনার ছেলেমেয়ে যখন বড় হয়ে উঠবে তখন এগুলি নিয়ে ভাবলে তাদের জীবন সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

৪.৫.৯ সামাজিক আদব কায়দা

একটি সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার জন্য আপনার সন্তানের প্রয়োজন মধুর আচার-আচরণ, মার্জিত চলাফেরা ইত্যাদি অভ্যাস করা। তাছাড়া আপনার সন্তানকে কথা-বার্তা বলার আদব কায়দা শেখান—যেমন বেশী জোরে বা বেশী আস্তে কথা না বলা, সবসময় কথা না বলা, অন্যের মতামত ধৈর্য্য ধরে শোনা ও বিরুদ্ধ মত রূঢ় না হয়ে ভদ্রভাবে প্রকাশ করা।

৪.৫.১০ শ্রদ্ধাবান হওয়া

গুরুজনদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করা আমাদের দেশের একটি পুরানো ও খুব সুন্দর একটি প্রথা। এটি করতে শিখলে আপনার সন্তানের মধ্যে বিনয়ের ভাব আসবে ও তারা গুরুজনদের আশীর্বাদ পাবে।

৪.৫.১১ শ্রমের মর্যাদা দান

শ্রমের মর্যাদা বুঝতে পারলে, আপনার সন্তান গণতান্ত্রিক ঐক্য সম্পর্কে

সম্যক ধারণা করতে পারবে। আপনার সন্তানকে তার নিজের ঘর, বাথরুম পরিষ্কার করা, ঘরের আবর্জনা বাইরে নিয়ে ফেলা, তার নিজের জামা-কাপড় ধোয়া ইত্যাদি কাজ করতে উৎসাহিত করুন। বাড়ীর কাজের লোক ও কুলি মজুরদের সাথে সৌজন্যপূর্ণ ভালবাসার সাথে আচরণ করার জন্যও আপনার সন্তানকে উৎসাহ দিন।

৪.৫.১২ উপযুক্ত সম্মান দেখানো

প্রাত্যহিক ঘরের কাজে যেগুলি লাগে, যেমন ঝাঁটা, জুতো ইত্যাদির প্রতি উপযুক্ত সম্মান করতে শেখান আপনার সন্তানকে। এই অভ্যাসগুলির ফলে আপনার সন্তানের মনে চারপাশের এই পৃথিবীর প্রতি সম্মানবোধ জন্মাবে।

৪.৫.১৩ তথ্য আদান প্রদানের দক্ষতা

শিশুরা তাদের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি তাদের পরিবার ও বন্ধুদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য স্বাভাবিকভাবেই ব্যগ্র হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে তাদের ভাব বিনিময়ের শক্তি বিকশিত হয়। আপনার সন্তানকে এই ব্যাপারে উৎসাহী করুন এবং তাকে কোন বিশেষ বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে শেখান। তারপর সেই বিষয় নিয়ে তাকে পরিবারের সদস্যদের ও বন্ধুদের জমায়েতে কথা বলতে উৎসাহিত করুন। এতে তাদের সুস্পষ্টভাবে চিন্তা করা ও অনেক লোকের সামনে কথা বলার ক্ষমতা এবং আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠবে।

৪.৫.১৪ সৃষ্টিমূলক শখ

শিশুদের প্রাণচাঞ্চল্য কোন মহৎ পথে প্রকাশিত হওয়া অত্যন্ত জরুরী। এই শক্তিকে ঠিকপথে চালিত করতে না পারলে, তার বিকৃত প্রকাশ ঘটতে পারে—হিংসা ও অপরাধমূলক কাজের মধ্য দিয়ে। আপনার সন্তানকে খেলাধূলা, গানবাজনা, ছবি আঁকা, রান্না করা, বাগান করার মত কিছু সৃজনশীল কাজ করতে উৎসাহিত করুন।

৪.৫.১৫ আপনার সন্তানকে মহৎ জীবন চরিত্রের সাথে পরিচয় করান

একটি মহৎ জীবন অন্যদের জীবনে প্রেরণা আনে। আপনার সন্তানকে মহান পৌরাণিক চরিত্র, সাধুসন্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামী, সমাজসেবী, বিজ্ঞানী ইত্যাদিদের জীবনের সাথে পরিচয় করান। উপাদান হিসেবে জীবনীগ্রন্থ, অমর চিত্রকথার মত কমিকস্ বই অথবা গল্প বলার মাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে। এইভাবে আপনার সন্তান তার দেশের সংস্কৃতির প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করবে।

৪.৫.১৬ আদর্শপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ

বর্তমান যুগে শত শত যুবকের আদর্শপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর বহুমুখী ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গসুন্দর বিকাশ ঘটেছিল। নিয়মিত শরীর চর্চার ফলে তাঁর দেহের গঠন ছিল সুঠাম। তিনি ছিলেন লাঠি খেলায় পারদর্শী, একজন পটু ঘোড়সওয়ার, অভিজ্ঞ গায়ক ও দক্ষ বাদক, তর্কযুদ্ধে অজেয়, একজন অসাধারণ বক্তা এবং মজলিসি আড্ডার মধ্যমণি। ইংরাজীভাষায় যেমন তাঁর ছিল বিস্ময়কর পাণ্ডিত্য তেমনি তাঁর মনঃসংযোগের ক্ষমতাও ছিল অতুলনীয়। তিনি ছিলেন অবিশ্বাস্য কর্মশক্তির অধিকারী এবং সর্বোপরি তাঁর ছিল সুগভীর ধ্যানতন্ময়তা ও অসাধারণ আত্মত্যাগ। অন্তর্নিহিত দেবত্ব অন্বেষণের তীব্র ব্যাকুলতায় তিনি এসে উপস্থিত হন তাঁর সুমহান গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। শ্রীরামকৃষ্ণের তত্ত্বাবধানে তাঁর ব্যক্তিত্ব শীঘ্রই হয়ে ওঠে নিখুঁত এবং সর্বাঙ্গ সুন্দর। দিব্য চরিত্র বলে ভূষিত হয়ে তিনি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন পুনরুজ্জীবনের জন্য একটি অসাধারণ জীবনযাপন করেন।

১৯৮৫ সাল থেকে ভারত সরকারের আইন অনুসারে প্রতি বছর স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন ১২-ই জানুয়ারী 'জাতীয় যুব দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে।

অধ্যায় ৫ শিক্ষকের ভূমিকা

যে কোন সামাজিক কার্যক্রমের সফলতা নির্ভর করে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার উপর। ১৮৯৪ সালে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে তাঁর ভারতীয় অনুরাগীদের সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে লেখেন ঃ ''ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিতে হইলে তাহার মূল রহস্যই এই সংহতি, শক্তিসংগ্রহ, বিভিন্ন ইচ্ছাশক্তির একত্র মিলন। একচিত্ত হওয়াই সমাজগঠনের রহস্য। আর যতই তোমরা আর্য-দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ প্রভৃতি তুচ্ছ বিষয় লইয়া বিবাদে ব্যস্ত থাকিবে, ততই তোমরা ভবিষ্যৎ ভারত—গঠনের উপযোগী শক্তি—সংগ্রহ হইতে অনেক দূরে সরিয়া যাইবে। কারণ এইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও যে, ভারতের ভবিষ্যৎ ইহারই উপর নির্ভর করিতেছে। এই ইচ্ছাশক্তিসমূহের একত্র সম্মিলন, এককেন্দ্রীকরণ—ইহাই রহস্য।'' (বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৫১-১৫২)

৫ শিক্ষকের উপর সমাজের আস্থা।

নৈতিক ও আত্মিক মূল্যবোধের দৃঢ় ভিত্তির উপরে আমাদের শিশুদের চরিত্র গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন সামাজিক শক্তির সঠিক সমন্বয় প্রয়োজন। বাস্তবিক, সমাজে শিক্ষকই এই সমন্বয় ঘটাতে পারেন কারণ তাঁকে সমাজ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করে। শিক্ষকদের প্রতি এই বিশ্বাস আমাদের জাতির এক মহান সম্পদ।

শিক্ষক হিসেবে, আপনার উপর অর্পিত এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে ছাত্রদের চরিত্র গঠনের কাজটি পূর্ণ উদ্যমে আপনার শুরু করা উচিত। এটি আপনার একটি পবিত্র সামাজিক দায়িত্ব।

এই দায়িত্ব একটি সামগ্রিক প্রচেষ্টার দ্বারাই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব। বাস্তবিক, চরিত্র গঠনের উদ্যোগে বাবা-মা, স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং

প্রতিবেশী সংস্থা—ইত্যাদি সকলেরই সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন। এই সহযোগিতা সফল হওয়া একান্তই নির্ভর করবে আপনার মনোভাব, মেজাজ ও বিচার শক্তির উপর। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত পরামর্শগুলি উপযোগী।

৫.১ ছাত্রদের সক্রিয় যোগদান করতে দিন।

সুপ্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে ছাত্র ও শিক্ষকের সুনিবিড় সম্পর্কের মূলে রয়েছে তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব। এই সনাতন ভাবটি বিধৃত রয়েছে উপনিষদের একটি প্রার্থনায়। ''ঈশ্বর আমাদের উভয়কে (আচার্য ও শিষ্যকে) সমভাবে রক্ষা করুন; (বিদ্যার সুফল প্রকাশিত করে) আমাদের উভয়কে পালন করুন। আমরা যেন সমান সামর্থ্যবান হই; অধীত বিদ্যা যেন আমাদের উভয়ের জীবনেই তুল্যভাবে তেজোদৃপ্ত হয়; আমরা পরস্পরকে যেন বিদ্বেষ না করি। আমাদের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক শান্তি হউক।''

চরিত্র-গঠন দলের আবশ্যকীয় সদস্যরা হলো ছাত্ররা নিজেরাই! তাদের সক্রিয় যোগদান ছাড়া জ্ঞানের আদান-প্রদান এবং চরিত্র গঠনের কাজটি অর্থহীন হয়ে যাবে। ছাত্রদেরকে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে সবসময় উৎসাহ দিন। এইভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারার ফলে চরিত্র গঠনের কাজকর্মের সাথে তাদের একাত্মতা গড়ে উঠবে ও তারা এই কাজ করার প্রেরণা পাবে।

৫.২ ছাত্রদের শ্রদ্ধা করবেন।

সবসময় এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রতিটি ছাত্রের মধ্যে, এমনকি সবচেয়ে দুষ্ট ছাত্রের মধ্যেও, দেবত্ব সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। এই কথাটি স্মরণ রাখলে ছাত্রদের সাথে আপনার ব্যবহার মর্যাদাপূর্ণ এবং স্নেহশীল হবে। ছাত্রদের প্রতি আপনার ব্যবহার তাদের চরিত্রের উপর বড় রকমের প্রভাব ফেলে। বাস্তবিক, ছাত্রদের প্রতি আপনার শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহারের

মাধ্যমে আপনার কাজ আরাধনায় রূপান্তরিত হবে।

৫.৩ ছাত্রদের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলুন।

মূল্যবোধ সঞ্চার করার অব্যর্থ মাধ্যম হল ভালবাসা। ছাত্রদের সাথে স্নেহের সম্পর্ক গড়ে তুললে, আপনাদের পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান সহজ হয়ে উঠবে। এর ফলে, ছাত্রদের মধ্যে আপনার কাছ থেকে শেখার ও আপনার শেখানো নৈতিক উপদেশগুলি কাজে লাগাবার ইচ্ছা জেগে উঠবে। ছাত্রছাত্রীদের জন্মদিনে তাদের শুভেচ্ছা জানানো, তাদের ও তাদের পরিবারের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেওয়ার মত ছোটখাট আচরণের মধ্য দিয়েও তাদের সাথে আপনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠবে। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের একটি উদ্ধৃতি খুব প্রাসঙ্গিক ঃ ''জগৎ এখন তাদের চায়, যাঁদের জীবন প্রেমদীপ্ত এবং স্বার্থশূন্য। সেই প্রেম প্রতিটি কথাকে বজ্রের মতো শক্তিশালী করে তুলবে।'' (পত্রাবলী, পৃঃ ৪৬২-৬৩, একাদশ সংস্করণ)

৫.৪ ছাত্রদের ব্যক্তিগত ভাবে চিনুন।

খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও ছাত্রদের সাথে সরাসরি মিশতে পারলে তাদের মনের উপর গভীর প্রভাব পড়ে। এর ফলে তাদের মনের শক্তি ও দুর্বলতা এবং তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি সম্বন্ধে আপনার ধারণা জন্মাবে। তার ফলে ছাত্রদের সাথে আপনার মেলামেশা করতে সুবিধা হবে। ছাত্রদের প্রত্যেককে আলাদা ভাবে ব্যক্তিগত মনোযোগ দেবেন।

৫.৫ ছাত্রদের সংগ্রাম করতে দিন।

জীবনে সংগ্রামের মধ্য থেকেই আনন্দ আসে। ছাত্রছাত্রীদেরকে তাদের নিজেদের সমস্যা বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করুন। কিন্তু তাদেরকে

স্বাধীনভাবে নিজেদের ভিতর থেকে উত্তর খুঁজতে, মৌলিক চিন্তা করতে এবং যে কোন পরিস্থিতিতে নিজ আদর্শে অবিচলিত থাকতে উৎসাহিত করুন। এইভাবে নিজে নিজে শেখার ফলে তারা চরিত্র-গঠনের প্রচেষ্টায় আপনার দায়িত্বশীল সহযোগী হয়ে উঠবে।

৫.৬ ছাত্রদের কখনো নির্দয়ভাবে বিচার করবেন না।

কোন ছাত্রকে কখনো অকর্মণ্য বলে ভাববেন না। একজন ছাত্রের সম্বন্ধে আপনার মনোভাব তাদের আচরণের ধারা ঠিক করে দেয়। কোন ছাত্রের ভুল কাজের সমালোচনা কখনো অন্যদের সামনে করবেন না। এতে তাদের মনে আঘাত এবং ফলে তাদের আত্মবিশ্বাস কমে যাবে। সমালোচনা না করে কিভাবে তারা উত্তোরত্তর উন্নতি করতে পারবে তার পথ দেখান।

৫.৭ চরিত্রকে আপনার মাপকাঠি করুন।

সবসময়ে ছাত্রছাত্রীদের চারিত্রিক উৎকর্ষতাকে তাদের লেখাপড়ায় সফলতার চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেবেন। বাস্তবিক, তাদের অর্জিত শুভ মূল্যবোধগুলিই জীবনে অনেক বেশী ফলপ্রসূ হবে। ছাত্রদের চরিত্র বিচারের নিরিখে স্বামী বিবেকানন্দের এই কথাগুলি অবশ্য স্মরণীয় ঃ ''যদি তুমি কোন ব্যক্তির চরিত্র যথার্থ বিচার করিতে চাও, তবে তাহার বড় বড় কার্যের দিকেই দৃষ্টি দিও না। অবস্থাবিশেষে নিতান্ত নির্বোধও বীরের মতো কার্য করিতে পারে। যখন কেহ অতি ছোট ছোট সাধারণ কার্য করিতেছে, তখন দেখ-সে কি ভাবে করিতেছে; এই ভাবেই মহৎ লোকের প্রকৃত চরিত্র জানিতে পারিবে। বড় বড় ঘটনা উপলক্ষ্যে অতি সামান্য লোকও মহত্ত্বে উন্নীত হয়। কিন্তু যাঁহার চরিত্র সর্বদা মহৎ, প্রকৃতপক্ষে তিনিই মহৎ। সর্বত্র সর্বাবস্থায় তিনি একই প্রকার।'' (বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৮-৩৯)

৫.৮ চরিত্র গঠনে বাবা মায়ের ভূমিকা

চরিত্র গঠনের কাজটি ত্বরান্বিত ও সফল করার জন্য বাড়ী ও স্কুলের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক অত্যন্ত জরুরী। ছাত্রের বাবা-মা এবং শিক্ষকের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং প্রচেষ্টা ছাত্রের চরিত্র গঠনের জন্য অত্যন্ত জরুরী।

৫.৯ প্রাথমিক মূল্যবোধ স্থির করার ব্যাপারে অভিভাবকদের পরামর্শ নিন।

মূল্যবোধ ছাত্রদেরকে সঠিকভাবে শেখাতে হলে একটি সুনির্দিষ্ট প্রণালীতে এগোতে হবে। এর প্রথম ধাপটি হবে ঃ একটি শিক্ষাবর্ষে কোন্ কোন্ মূল্যবোধের উপর জোর দেওয়া হবে সেগুলি স্থির করা। ছাত্রদের বাবা মাকে সাথে নিয়ে এই মূল্যবোধগুলি স্থির করুন ও আলোচনা করুন কিভাবে তাঁরা বাড়ীতে এই মূল্যবোধগুলিকে তাঁদের সন্তানকে শেখাতে পারেন।

৫.১০ চরিত্র গড়ার নানা পদ্ধতিগুলি অভিভাবকদেরকে বুঝিয়ে দিন।

অভিভাবকরা হয়ত মূল্যবোধ শেখানোর পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত থাকবেন না। কাজেই এই চরিত্র গঠনের প্রচেষ্টায় তারা কিভাবে সহযোগিতা করবেন সে সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট ধারণা নাও থাকতে পারে। তাদের নিজেদের ভূমিকা পালনে অনুপ্রেরণা দিয়ে ও চরিত্র-গঠন সম্পর্কিত বিভিন্ন বই পত্র দিয়ে সাহায্য করতে হবে।

৫.১১ দেশ-গঠনের মানসিকতা নিয়ে কাজ করুন।

চরিত্র-গঠন আন্দোলনের প্রতিভূ হিসেবে শিক্ষকদের নিজেদের সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা থাকা খুব জরুরী। সবসময়ে মনে রাখবেন যে আপনি একজন

কর্মচারী মাত্র নন — ভারতবর্ষের একজন গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক হিসাবে আপনি এক পবিত্র সামাজিক দায়িত্ব পালন করছেন। কর্মজীবনের নানাবিধ সমস্যা যখন সাময়িক হতাশার সৃষ্টি করবে—তখন নিজেকে এবং অন্যান্য সহকর্মীদের মনে করাবেন যে আপনারাই মূল্যবোধের গুরু দায়িত্বটি বহন করছেন। নিজের সম্বন্ধে এইরকম ধারণা থাকলে কাজ করার তীব্র শক্তি ও অনুপ্রেরণা আসবে। বাস্তবিক, শিক্ষকরাই স্বামী বিবেকানন্দের এই বহুশ্রুত আহ্বানে একমাত্র সাড়া দিতে পারেন ঃ

''যদি বর্তমান কালের মনুষ্য জাতির খুব সামান্য অংশও স্বার্থপরতা সঙ্কীর্ণতা ক্ষুদ্রত্ব ত্যাগ করিতে পারে, তবে কালই এই জগৎ স্বর্গে পরিণত হইবে; নানাবিধ যন্ত্র এবং বাহ্য জগৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতিতে কখনও হইবে না। যেমন অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ করিলে অগ্নিশিখা আরও বর্ধিত হয়, তেমনি এগুলি দুঃখই বৃদ্ধি করে।

যখন ভারতে এমন লোক জন্মাবে, যারা দেশের জন্য সব ছাড়তে প্রস্তুত, আর যাদের মন মুখ এক, তখন ভারতেও সব বিষয়ে বড় হবে। মানুষ নিয়েই তো দেশের গৌরব। শুধু দেশে আছে কি?'' (বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৭, ঊনবিংশতি পুনর্মুদ্রন; বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ২৯৯)

৫.১২ দলবদ্ধ হয়ে কাজ করার মনোভাব।

স্কুলে চরিত্র গঠনের সার্থকতা নির্ভর করে শিক্ষকদের একত্র হয়ে কাজ করার উৎসহের উপর। এই ধরণের সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলার জন্য আপনারও কিছু সুনির্দিষ্ট কর্তব্য আছে, যেমন, সামগ্রিক উদ্দেশ্যটি সফল করার জন্য ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দেওয়া, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা, অন্যের দোষ না দেখানো ইত্যাদি।

৫.১৩ সমাজ সচেতনতা সৃষ্টি

চরিত্র গঠন আন্দোলনে সফলতার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল স্থানীয়

মানুষদের সক্রিয় সহযোগিতা। স্কুল ও সমাজের মধ্যে এই পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষকদের ও স্কুল প্রশাসনের।

৫.১৪ স্কুলকে সমাজের কেন্দ্রবিন্দু করা।

স্কুলকে সমাজের মূলকেন্দ্র করুন। এইভাবে চরিত্র গঠনের কাজে সমাজের নৈতিক, আর্থিক ও সেবামূলক সমর্থন সুনিশ্চিত করুন। ব্যাঙ্ক, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান, সমবায় সমিতি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সরকারী বিভাগ যেমন—পুলিশ, দমকল বাহিনী, স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ রাখুন ও আন্তরিক ভাবে তাদের সাথে মেলামেশার সম্পর্ক গড়ে তুলুন। স্কুল সম্পর্কিত আলোচনায় তাদের যোগ দিতে সুযোগ দিন।

৫.১৫ সমাজের দক্ষ ব্যক্তিদের শিক্ষক হিসাবে আমন্ত্রণ করুন।

সমাজের দক্ষ ব্যক্তিদেরকে তাদের কর্মনীতি, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি স্কুলের সাথে ভাগ করে নেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। সমাজের সব স্তরের মানুষকে যেমন—ছোট ব্যবসায়ী, কোম্পানির বড় কর্মচারী, সরকারী কর্মী যেমন বাস ড্রাইভার, ডাক বিভাগের কর্মচারী, বড় অফিসার ইত্যাদিদের আমন্ত্রণ করুন। এইভাবে আদান প্রদানের ফলে ছাত্রদের মধ্যে সমাজ সচেতনতা এবং সমাজের সাথে একাত্মবোধ গড়ে উঠবে। সমাজের মানুষের মধ্যেও ছাত্রদের কল্যাণ করার দায়িত্ববোধ জেগে উঠবে।

৫.১৬ নিজেকে প্রস্তুত করার উপায়।

ক) যে পাঠ পড়াবেন তার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হবেন। বিনা প্রস্তুতিতে ক্লাস নিতে যাওয়া একটি নৈতিক অপরাধ এবং ছাত্রদের শিখবার পথে নিশ্চিত বাধা সৃষ্টি করবে।

খ) আত্মসমীক্ষণ ও নিজেকে নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করতে

শিখুন। শিক্ষক ঠিকভাবে পড়াতে না পারার ফলেই ছাত্ররা সফলতা লাভ করতে পারে না।

গ) ছাত্রদের মধ্যে প্রশ্ন করে উত্তর জানার আগ্রহ ও সূক্ষ্ম চিন্তা করার ক্ষমতা জাগিয়ে তুলুন।

ঘ) স্কুলের সব কাজে ঠিক সময়ে এসে ছাত্রদেরকে সময়ের গুরুত্ব বোঝান।

ঙ) ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত গোপন তথ্য বা স্কুলের গোপন তথ্য যে কোন ব্যক্তির সাথে আলোচনা করবেন না।

চ) নিজের পেশার উন্নতির জন্য ক্রমাগত অধ্যয়ন, গবেষণা, আলোচনা সভায় যোগদান ইত্যাদি অত্যন্ত জরুরী।

ছ) বাড়তি পারিশ্রমিক নিতে কখনো রাজী হবেন না। এতে আপনার নৈতিক বোধ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ছাত্রছাত্রীদের চোখে আপনার মর্যাদা কমে যাবে।

অধ্যায় ৬ বালক সঙ্ঘ—মূল্যবোধ শিক্ষার একটি প্রয়াস

এটা খুব আশ্বাসের বিষয় যে আমাদের সমাজে মূল্যবোধের ভিত্তিতে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়ছে যাতে ছাত্রদের মধ্যে মানবিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ ঘটে।

৬ ইউনেস্কো প্রতিবেদন (UNESCO Report)

ইউনেস্কো (UNESCO) কমিশন দ্বারা প্রকাশিত 'Learning : the treasure within' রিপোর্ট অনুযায়ী শিক্ষা চারটি ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে যথা, Learning to Know (জ্ঞান অর্জন করার জন্য শিক্ষা), Learning to do (হাতে কলমে কাজ করার শিক্ষা), Learning to Live Together (সবার সাথে একসাথে মিলেমিশে থাকার শিক্ষা) ও Learning to be (মানুষ হবার শিক্ষা)।

এদের মধ্যে প্রধান স্তম্ভটি হল সবার সাথে একসাথে বাঁচতে শেখা। বাস্তবিক, এটিই একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার ভিত্তি।

৬.১ ভারতবর্ষের পরিস্থিতি

১৯৮৬ সালে ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষা নীতিতে (NPE) শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন করার কথা বলা হয়েছে। ১৯৯২ সালে এই নীতির সংশোধনের ফলে বিভিন্ন সংস্থাকে নির্দিষ্ট দায়িত্বভার দিয়ে এক কর্মপ্রণালী তৈরী হয়। এই সংস্থাগুলি হলো, এন.সি.ই.আর.টি (NCERT) এস.সি.ই.আর.টি (SCERT) বিশ্ববিদ্যালয়, ডি.আই.ই.টি (DIET), ডি.পি.ই.পি (DPEP), বি.ই.ও (BEO) ইত্যাদি। এই সব সংস্থাকে—জাতীয়, রাজ্য, জেলা ও মহকুমা স্তরে শিক্ষানীতি ও শিক্ষার গুণগত মানের তত্ত্বাবধানের কাজে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি (NPE) অনুযায়ী, শিক্ষার গুণগত মানের লক্ষণ হলো ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন

পাঠ্য বিষয়ে কৃতিত্ব এবং সুনাগরিক হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবোধের অনুশীলন।

মূল্যবোধ শিক্ষার নীতি নির্ধারণের জন্য গঠিত পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি (১৯৯৯) তাদের প্রতিবেদনে সার্বজনীন মানবিক মূল্যবোধগুলি যেমন—সত্য, ন্যায়পরায়ণতা, আচরণ, শান্তি, প্রেম ও অহিংসা ইত্যাদি ছাত্রদের মধ্যে দৃঢ়মূল করে দেওয়ার কথা বলেছেন।

৬.১.২ মূল্যবোধ শিক্ষার কেন্দ্র আরম্ভ করার প্রয়োজনীয়তা

আমাদের জাতীয় শিক্ষাপ্রণালীকে মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে তোলার বিবিধ প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। কিন্তু, এই প্রচেষ্টাগুলি বিগত কয়েক দশক ধরে চললেও বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায়নি। এমতাবস্থায় বাবা-মা, শিক্ষক ও সমাজ নিশ্চয়ই কিছু করতে পারেন। বাস্তবিক, এই ধরণের সফলতার জন্য দরকার কয়েকজন নিঃস্বার্থপর ব্যক্তির আন্তরিক প্রয়াস। তাই, বাবা-মা ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা মিলে পাড়ায় পাড়ায় আনুষ্ঠানিকভাবে মূল্যবোধ শিক্ষার ব্যবস্থা আরম্ভ করতে পারেন। এগুলি সাত থেকে ষোল (৭-১৬) বছরের শিশু/কিশোরদের জন্য 'বালক সংঘ' হিসেবে ও মেয়েদের জন্য 'বালিকা সংঘ' হিসাবে আরম্ভ করা যেতে পারে।

৬.২ বালক/বালিকা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করা

এই ধরণের মূল্যবোধ শিক্ষাকেন্দ্র চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় কিছু নির্দেশাবলী নিম্নলিখিত বিষয়ের ভিত্তিতে আলোচনা করা হল ঃ

ক) কেন্দ্রের উদ্দেশ্য

খ) কেন্দ্র গড়ার প্রস্তুতি

গ) যোগ্য পরিচালক স্থির করা

ঘ) কাজের ধারা ঠিক করা।

যদিও এই নির্দেশগুলি বালক সংঘ ও বালিকা সংঘ উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য, লিখবার সুবিধার জন্য কেবল বালক সংঘের উল্লেখ করা হয়েছে।

ক উদ্দেশ্য

এই ধরণের প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হবে শিশুদের একত্রে এনে তাদের শারীরিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক এবং আত্মিক শক্তির বিকাশের জন্য কিছু নিত্য কর্মসূচীর (programme) ব্যবস্থা করা। এর দ্বারা তারা 'হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে, মস্তিষ্ক দিয়ে নতুন ভাবনা ভাবতে এবং হাত দিয়ে কাজ করতে শিখবে।'

'বালক সংঘ' শিশুদের উৎসাহিত করবে—

ক) আমাদের দেশের মিশ্র সংস্কৃতির প্রতি তাদের আগ্রহ জাগাতে ও তাদের সাধু-সন্ত, ভক্ত, দেশপ্রেমী ও সমাজসেবীদের জীবনী ও অবদান সম্বন্ধীয় বই পড়তে। তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও দেশভক্তির ভাব এইভাবে জেগে উঠবে।

খ) সংঘের বাকী সদস্যদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাবে মেলামেশা করতে।

গ) দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন হতে ও আনন্দের সাথে বাড়ীর ও সমাজের কাজের দায়িত্ব নিতে। তাদের বোঝা জরুরী যে নিজেদের কল্যাণ ছাড়াও অন্য সব নাগরিকদের কল্যাণের জন্য কাজ করাও তাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

ঘ) সামাজিক আচার-আচরণ ও কাজ করার কৌশল অনুশীলন করতে। তাদেরকে ধীরে ধীরে সতর্কতা, নিয়মনিষ্ঠা, সময়ানুবর্তিতা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় গুণাবলী আয়ত্ত করতে হবে যাতে তারা আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে পারে।

খ প্রস্তুতির কাজ

৬.৩ স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ

স্থানীয় ব্যক্তিদের চরিত্র গঠন আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য

উৎসাহিত করুন। পাড়ার মিটিংএ তাদের ডাকুন ও এই শুভ আন্দোলনটি শুরু করুন। পাড়ার সচ্চরিত্র লোকেদের প্রথম থেকেই আন্দোলনের সাথে যুক্ত রাখবেন। কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যেন এর সাথে রাজনীতির কোন ছোঁয়া না লাগে।

৬.৩.১ শিশুদের সদস্য করুন

৭ থেকে ১৬ বছর বয়সের শিশুদের বালক সংঘে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করুন। ভর্তি হওয়ার জন্য একটি আবেদন পত্র (application form) তৈরী করুন যার মধ্যে ছেলেদের ঠিকানা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আগ্রহের বিষয়ে লেখা থাকবে। এই ফর্মে বাবা/মায়ের লিখিত অনুমতি দেওয়ার জায়গা রাখবেন। এলাকার লোকের আর্থিক সঙ্গতির উপর নির্ভর করে সামান্য ফী নেওয়ার ব্যবস্থা রাখবেন।

৬.৩.২ শিক্ষকদের নিযুক্তীকরণ

উৎসর্গীকৃত এবং উৎসাহী শিক্ষকরা বালক সংঘের স্তম্ভের মত। পেশাদার শিক্ষকদের এবং অন্যদেরও (যেমন,—অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, অফিসার, ডাক্তার ও কলাশিল্পী) সাহায্য নিন।

৬.৩.৩ পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ

সংঘের কাজকর্ম চালানোর জন্য অর্থ লাগবে। সেইহেতু, ব্যক্তিগত দান এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতার ব্যবস্থা করুন। তবে বালক সংঘ গড়ার মূল উপাদান টাকা নয়—দরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অভিজ্ঞ মানুষ ও উৎসাহী বালকের দল।

৬.৩.৪ সংঘের জন্য নির্দিষ্ট স্থান

বালক সংঘের একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকা দরকার। পাড়ার সমাবেশ কেন্দ্র, মন্দির, মসজিদ, চার্চ, গুরুদ্বার বা স্থানীয় স্কুলবাড়িও এজন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

৬.৩.৫ সময়সূচী

প্রাথমিকভাবে সংঘের কাজ শুধু রবিবারে শুরু করা যেতে পারে। কিছুদিন পর থেকে (সবদিক দিয়ে মোটামুটি গুছিয়ে উঠলে), রোজই কেন্দ্রে কাজ হতে পারে। তবুও কেন্দ্রের দুটি বিভাগ রাখা দরকার—একটি তাদের জন্য যারা রোজই আসতে পারবে এবং আরেকটি যারা শুধু রবিবার আসতে পারবে তাদের জন্য। শিক্ষকের সংখ্যা কম হলে শুধু রবিবারেই ক্লাসের ব্যবস্থা করবেন এবং যারা আসবে তাদের সুবিধানুযায়ী ক্লাস সকালে না বিকালে হবে তা ঠিক করবেন।

৬.৩.৬ লাইব্রেরি গড়ে তুলুন

ছোটদের উপযোগী নানা রকম বই যেমন উপনিষদের গল্প, পৃথিবীর নানা ভাষায় সাহিত্যের বই, সাধুসন্ত, বিজ্ঞানী, দেশনেতা ও সমাজসেবীদের জীবনী ও আত্মজীবনী, পরিবেশ, শিল্পকলা সম্পর্কিত এবং ইতিহাসের বই দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। এইধরনের বই অল্প অল্প করে কিনবার ব্যবস্থা করুন। বইগুলি কেন্দ্রের আলমারীতে বা পরিচালকের বাড়ীতে সাজিয়ে রাখা যেতে পারে। স্থানীয় লাইব্রেরির সাথে যোগাযোগ করে কেন্দ্রের সদস্যদের সেখান থেকে বই ধার নেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

৬.৪ পরিচালক স্থির করা

বালক সংঘের স্থাপনা ও অগ্রগতি নির্ভর করবে পরিচালকের ব্যক্তিত্বের উপর। শিশুদের ব্যক্তিত্ব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গড়ে তোলা যায়। কাজেই পরিচালকের শিল্প, কলা, সাহিত্য, সঙ্গীত ও নাটক সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

শিশুরা একজায়গায় জড়ো হলে পরস্পরের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি, ঈর্ষা ইত্যাদি হওয়ার সম্ভাবনা। কাজেই শিশুদের মনস্তত্ব সম্বন্ধে পরিচালকের কিছুটা ধারণা থাকা দরকার যাতে তিনি এই ব্যাপারগুলি ঠিকমত সামলাতে পারেন।

এই কেন্দ্রে ছেলেরা ব্যক্তিত্ব বিকাশের কৌশল শিখবে। কাজেই পরিচালকের ব্যক্তিত্বে সদ্‌গুণের প্রকাশ অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় যেমন সৌজন্য, উদারতা, ধৈর্য, শৃঙ্খলা, সত্যনিষ্ঠা ও সবাইকে সমানভাবে দেখা ইত্যাদি গুণগুলি। ছেলেদের প্রতি পরিচালকের মায়ের মত স্নেহ ভালোবাসা থাকা দরকার। বাস্তবিক, এই জগতে ভালোবাসা সবচেয়ে শক্তিশালী।

তবে একথাও ঠিক যে এইরকম সর্বগুণ সম্পন্ন পরিচালক খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু আবার এইরকম ব্যক্তি ছাড়া বালক সংঘ আরম্ভই করা যাবে না। কাজেই এই বাঞ্ছিত গুণগুলির মধ্যে কয়েকটি যার মধ্যে আছে তাকেই পরিচালকের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। তবে তাকে সংঘের কাজ করতে করতে বাকী এই গুণগুলি ধীরে ধীরে আয়ত্ব করার জন্য আন্তরিক প্রয়াস করতে হবে।

গ সংঘের কাজকর্ম

৬.৫ কাজকর্ম ঠিক করা

বালক সংঘের কাজকর্মের উদ্দেশ্য হবে বালকদের শারীরিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক ও আত্মিক শক্তির বিকাশ। এই শক্তিগুলির একসাথে বিকাশ ঘটলে তবেই পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠবে।

৬.৬ শরীরকে গড়ে তোলা

১৮৯৬ সালে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শিষ্য শ্রী আলাসিংগা পেরুমলকে লিখেছিলেন ঃ ''আমি চাই এমন লোক—যাদের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাত নির্মিত আর তাদের মধ্যে থাকবে এমন একটি মন, যা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য, মনুষ্যত্ব—ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ।'' (বাণী ও রচনা ৫ঃ১১৭)

স্বামীজীর নির্দেশিত এই ধরণের শারীরিক বিকাশের জন্য ছেলেদের ফুটবল, কবাডী, খো খো ইত্যাদি খেলা খেলতে হবে। বিশেষ করে যোগাসন করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে ও এটিকে ছেলেদের মধ্যে জনপ্রিয়

করে তুলতে হবে। যোগাসনের জন্য কোন সরঞ্জাম লাগে না এবং খোলামেলা ছোট ঘরের মধ্যে নিজেই স্বাধীনভাবে করা যায়। যোগাসনের একটি বিশেষ অঙ্গ প্রাণায়াম যার দ্বারা ছেলেদের কর্মশক্তির পুনরুজ্জীবন ঘটে। বিশেষ করে, প্রাণায়ামের দ্বারা মনসংযোগ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি গড়ে ওঠে যা ছেলেদের পড়াশুনা বা ধ্যান করার সময় স্থির হয়ে বসে থাকতে সাহায্য করে।

৬.৭ বৌদ্ধিক ও নৈতিক বোধের অনুশীলন

ছেলেদের বৌদ্ধিক বিকাশের কাজটি বেশ কঠিন। ছেলেদের ক্রমশ মহৎ চিন্তার সঙ্গে পরিচিত করান। এর জন্য, নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করতে পারেন ঃ

ক) ধারণামূলক আলোচনা

খ) জীবনীমূলক আলোচনা

গ) গল্পবলার মাধ্যমে আলোচনা

ঘ) সমবেত আলোচনা (Group discussion)

৬.৭.১ ধারণামূলক আলোচনা

নৈতিকতা শেখানোর জন্য এটি একটি সরাসরি উপায়। সত্য, অহিংসা, সাহস, বন্ধুত্ব, আত্মনিয়ন্ত্রণ, সময়ানুবর্তিতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সততা, ইচ্ছাশক্তি, সেবা, দান, বিশ্বাস, সৌন্দর্য—ইত্যাদি মূল্যবোধগুলির মধ্যে যেকোন একটিকে আলোচনার বিষয় হিসাবে বেছে নিন।

প্রথম ধাপ ঃ

♦ ভূমিকা হিসেবে অনেক উদাহরণের মাধ্যমে এই মূল্যবোধটির ব্যাখ্যা করুন।

♦ এর কোন তাত্ত্বিক সংজ্ঞা শেখাবার চেষ্টা করবেন না। আপনার উদ্দেশ্য হবে ছেলেরা যেন আলোচ্য মূল্যবোধটিকে সহজভাবে নিজের মত করে বুঝতে পারে।

দ্বিতীয় ধাপ ঃ

♦ মহান ব্যক্তিদের জীবনী ও দৈনন্দিন নানা ঘটনার উদাহরণ দিয়ে মূল্যবোধটির অর্থ ও তার উপকারিতা ব্যাখ্যা করুন যাতে এর সবদিক বোঝা যায়।

তৃতীয় ধাপ ঃ

♦ দৈনন্দিন যেসব ঘটনায় ব্যক্তি ও সমাজের উপকারের জন্য এই মূল্যবোধের প্রয়োগ করা হয় সেগুলি তাদের সামনে তুলে ধরুন।

৬.৭.২ জীবনীমূলক আলোচনা ঃ

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ''পৃথিবীর ইতিহাস কয়েকজন আত্মবিশ্বাসী মানুষেরই ইতিহাস। সেই বিশ্বাসই ভিতরের দেবত্ব জাগ্রত করে।" *(বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড ঃ পৃ. ১৩২)* নীতিতে অটুট বিশ্বাস রেখে জীবনে সাফল্য পেয়েছেন এমন একজন ব্যক্তিত্বের জীবনী বা আত্মজীবনী বেছে নিন। এর দ্বারা ছেলেরা তাদের নিজেদের জীবনে এই মূল্যবোধটিকে অনুসরণ করার জন্য গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হবে।

ধাপ ঃ

♦ একজন উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব বাছুন।

♦ জীবনী গ্রন্থ অনুসরণ করলে, বিভিন্ন লেখকের লেখা জীবনীর উল্লেখ করুন যেখানে এই ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধে নানা দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ আছে।

♦ এই ব্যক্তিটির জন্ম, পরিবার, সামাজিক পরিবেশ এবং ছোটবেলার শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করুন। তাঁর চরিত্র গড়ে ওঠার বিভিন্ন কারণগুলি নিয়ে আলোচনা করবেন।

♦ তাঁর জীবনের নানা ঘটনা নিয়ে আলোচনা করুন যাতে ছেলেরা বুঝতে পারে সেই সময়ে তিনি কেন ঐরকম করেছিলেন ও তার ফলে কি হয়েছিল।

এই পদ্ধতির উপকারিতা ঃ

জীবনী বা আত্মজীবনী নানা মনস্তাত্ত্বিক উপাদান মিশিয়ে সত্যিকার জীবনের বর্ণনা হওয়ায় এগুলির আলোচনার মাধ্যমে ছেলেদের আগ্রহ ধরে রাখা সহজ হয়।

এইভাবে বয়ঃসন্ধিকালের ছেলেরা তাদের কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপিত করতে পারে এমন একটি চরিত্রের খোঁজ পাবে ও সেই অনুযায়ী তারা তাদের জীবনকে গড়ে তুলতে পারবে।

৬.৭.৩ গল্প বলার মাধ্যমে আলোচনা ঃ

ছেলেদের আগ্রহ আকর্ষণ করার সবচেয়ে ভাল উপায় হল গল্প। এর মাধ্যমে তাদের কল্পনাশক্তি ও স্মৃতিশক্তিকে জাগানো যায়। এগুলি তাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে এবং আবেগকে শুদ্ধ করে তোলে। গল্প বলা একটি শিল্পকলা। শিক্ষক যেন বই থেকে দেখে দেখে গল্প না বলেন।

ধাপগুলি ঃ

- একটি উপযুক্ত গল্প বাছুন।
- গল্পটি পড়ে প্রথমে ভালোভাবে বুঝুন এবং তীব্র আবেগের জায়গাগুলি চিহ্নিত করুন।
- গল্পটি আকর্ষণীয়ভাবে বলবেন। দীর্ঘ মুখবন্ধ দেবেন না।
- ছেলেরা বুঝতে পারে এমন শব্দ ব্যবহার করবেন।
- স্পষ্ট ও মনোগ্রাহী স্বরে গল্প বলবেন।
- ভাল ছবি আঁকতে পারলে বোর্ডের সাহায্য নিয়ে উদাহরণ দিন।
- যেখানে সম্ভব উক্তির উদ্ধৃতি দিন।
- সবশেষে গল্পটির নায়কের চরিত্র নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

এই পদ্ধতির উপকারিতা ঃ

- সব বয়সের ছেলেদের জন্য উপযোগী।
- ছেলেরা গল্প সংগ্রহ করতে, গল্প বলতে ও নিজেরা গল্প লিখতে অনুপ্রাণিত হবে।

৬.৭.৪ সমবেত আলোচনা (Group Discussion)

কোন বিষয় আলোচনা করার অর্থ হল সেই বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ও ধারণার আদান প্রদান। কোন প্রশ্নের সবচেয়ে ভাল উত্তর খোঁজার এটি একটি আদর্শ উপায়।

ধাপগুলি ঃ

- আলোচনা করার জন্য একটি সমস্যা বাছুন।
- ছেলেদের একসাথে বসার ব্যবস্থা করুন।

আলোচনা চালাবার জন্য কিছু প্রাথমিক নিয়ম ঠিক করুন, যেমন— ধীরে কথা বলা, অন্যের মত মন দিয়ে শোনা, নিজের মত বলার সময় অতিরিক্ত আবেগ প্রকাশ না করা, কোন বক্তাকে বাধা না দিয়ে তার বক্তব্য বলতে দেওয়া, অন্যকে অপমান বা আঘাত দেওয়ার মত কোন ব্যক্তিগত মন্তব্য না করা, নিম্নস্বরে পাশের ছেলের সাথে কথা না বলা, পুরো আলোচনা নিজস্ব কুক্ষিগত না করা ইত্যাদি।

- একটি ছেলেকে আলোচনার বিবরণী লেখার দায়িত্ব দিন।
- আলোচনা শুরু করানোয় নেতৃত্ব দিন ও ছেলেদের তাদের নিজেদের মত প্রকাশ করতে বলুন।
- একটি গণতান্ত্রিক আবহাওয়া সৃষ্টি করার দিকে খেয়াল রাখুন এবং লক্ষ্য রাখুন যাতে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক ছেলে আলোচনায় যোগ দেয়।
- প্রত্যেককে প্রশ্ন করতে ও নিজের মত প্রকাশ করতে উৎসাহিত করুন।

♦ কেউ আলোচনার নিয়ম ভাঙলে তা নির্দেশ করুন ও সবাইকে নিয়ম মানতে বাধ্য করুন।

♦ সরাসরি আলোচনাকে নিয়ন্ত্রণ না করে সহায়কের ভূমিকা পালন করুন।

♦ সবশেষে আলোচনার মধ্যে দিয়ে উঠে আসা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি উল্লেখ করে একটি সারাংশ দিন।

এই পদ্ধতির উপকারিতা ঃ

♦ ছেলেরা কোন সমস্যার সমাধানের জন্য ঠিকভাবে আলোচনা করতে শেখে।

♦ লাজুক ছাত্ররা আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে উৎসাহী হয়।

♦ ছেলেরা নিজেদের সুপ্ত ক্ষমতা আবিষ্কার করতে ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেখে। তাদের মধ্যে যুক্তিপূর্ণ চিন্তা করার, বিচারশক্তির ও স্পষ্ট বক্তব্য প্রকাশ করার ক্ষমতা গড়ে ওঠে।

৬.৮ প্রতিযোগিতা আয়োজন করুন

সুস্থ প্রতিযোগিতা মনকে উৎসাহী ও সজাগ রাখে। প্রত্যেক তিন বা ছয়মাস অন্তর বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে পারেন, যেমন—

ক) রচনা লেখা,

খ) বক্তৃতা দেওয়া,

গ) বিতর্ক (debate)

ঘ) গল্প বলা

ঙ) স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা ইত্যাদি।

খেয়াল রাখবেন সব ছেলেই যেন প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়।

৬.৮.১ রচনা লেখা

কোন মহান গ্রন্থের যে কোন ভাব, মহাপুরুষদের জীবনী ও বাণী,

কোন স্থানের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, রাজ্য বা দেশের বর্তমান পরিস্থিতি, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর কাজকর্ম ও আচরণ ইত্যাদির থেকে রচনা প্রতিযোগিতার বিষয় বাছা যেতে পারে।

◆ বিষয়টির নিয়ে কিভাবে লিখতে হবে তা নির্দেশ করে দিন।

◆ ছেলেদের হাতের লেখা, গুছিয়ে লেখা, শুরু ও শেষ করা, বাক্যগঠন করা ও রচনাশৈলী ইত্যাদি সম্বন্ধে নির্দেশ দিন।

৬.৮.২ বক্তৃতা প্রতিযোগিতা

◆ প্রতিযোগিতার তিনদিন আগে ছেলেদের বক্তৃতার বিষয় জানিয়ে দেবেন যাতে তারা বিষয়টির সম্বন্ধে জেনে প্রস্তুত হয়ে আসতে পারে।

◆ ছেলেদেরকে বক্তৃতা দেওয়ার সময় তাদের মুখভঙ্গী, বিষয় অনুযায়ী কিরকম দাঁড়ানোর ভঙ্গি ও মনোভাব নিতে হয়, কথা বলা, বিষয়টি সম্বন্ধে বলতে শুরু করা, ব্যাখ্যা করা ও শেষ করা সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দিন।

◆ বক্তৃতা প্রতিযোগিতা থেকে অনেক কিছু শেখা যায় এবং এতে খুব আনন্দও পাওয়া যায়।

৬.৮.৩ বিতর্ক (debate) প্রতিযোগিতা

◆ ছেলেদের পক্ষে তর্ক করার উপযোগী বিষয় বাছুন ও প্রতিযোগিতার তিনদিন আগে তাদের জানিয়ে দিন। 'কলম তলোয়ারের চেয়ে বেশী শক্তিশালী' বা 'সুখী জীবনের জন্য বিজ্ঞানই যথেষ্ট, ধর্মের কোন প্রয়োজন নেই' এইরকম বিষয় বাছতে পারেন।

◆ প্রত্যেক প্রতিযোগীকে বলার জন্য চার মিনিট (৩+১) বা পাঁচ মিনিট (৪+১) দেবেন।

◆ প্রতিযোগীদের বিচার করার সময় প্রত্যেক প্রতিযোগী কিভাবে বক্তব্য রাখছে, বক্তব্যের সমর্থনে কি যুক্তি উপস্থাপন করছে, প্রতিপক্ষের ভুল ও অযৌক্তির বক্তব্য কিভাবে খণ্ডন করছে তার উপর নির্ভর করে নম্বর দিন।

৬.৮.৪ গল্প বলার প্রতিযোগিতা

♦ প্রত্যেক প্রতিযোগী একই গল্প বা নিজেদের পছন্দসই গল্প বলতে পারে।

♦ প্রত্যেক ছেলেকে দশ মিনিট সময় দেবেন।

♦ প্রত্যেকের গল্প বলার সময় তার ভঙ্গিমা, উপস্থাপনা, মুদ্রাদোষ ও শ্রোতাদের উপর গল্পবলার প্রভাব ইত্যাদি লক্ষ্য করতে হবে।

৬.৮.৫ স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা

♦ নানাধরণের অনেকগুলি জিনিস একজায়গায় রেখে ছেলেদের সেগুলি দশ মিনিট ধরে দেখতে দিন। তারপরে ছেলেদের অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে তাদের দেখা জিনিসগুলির নাম মনে করে লিখতে বলুন।

♦ সবাইকে এক জায়গায় বসিয়ে ১০/১৫টা জিনিসের নাম বলুন। তারপরে ছেলেদের বলুন এক এক করে জিনিসগুলির নাম বলতে।

৬.৯ আত্মশক্তির বিকাশ

আমাদের প্রত্যেকের ভিতরের সুপ্ত আত্ম শক্তির বিকাশের কয়েকটি প্রকৃষ্ট উপায় আছে। সেগুলি হলো—

ক) প্রার্থনা

খ) ভজন

গ) ধ্যান

ঘ) নৈতিক ব্রত গ্রহণ

৬.৯.১ প্রার্থনা ও ভজন

পৃথিবীর নানা ধর্মগ্রন্থ থেকে উপযুক্ত প্রার্থনা বেছে নিন। ছেলেদের বৈদিক মন্ত্র আবৃত্তি করতে শেখান। তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিক্ষাবল্লীর নিম্নোদ্ধৃত স্তোত্রটি ছেলেদের পাঠ করতে শেখাতে পারেন।

''ওঁ-শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব

প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি।।"

সূর্য ও বরুণ আমাদের প্রতি সুখপ্রদ হউন, অর্যমা (রাত্রির দেবতা) সুখকর হউন, ইন্দ্র ও বৃহস্পতি আনন্দপ্রদ হউন। বিস্তীর্ণ পাদক্ষেপণকারী বিষ্ণু আমাদের মঙ্গলকারী হউন। ব্রহ্মাকে নমস্কার। বায়ুকে নমস্কার। হে বায়ু, তুমি প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্মারূপে বলিব। উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ঋত (ব্রহ্ম) স্বরূপে বলিব। সত্যস্বরূপে বলিব। সেই ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন। আমার আচার্যকে রক্ষা করুন। আমাকে রক্ষা করুন। আমার আচার্যকেও রক্ষা করুন। ত্রিবিধ শান্তি হউক আমাদের জীবনে।

৬.৯.২ পরিচালিত ধ্যান

ভজন ও স্তোত্রপাঠের পর পাঁচ মিনিটের জন্য ধ্যান পরিচালনা করুন। আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি বিকাশের চাবিকাঠিটি হল ধ্যান। বাস্তবিক, আত্মজ্ঞান, অবিচলিত আত্মনির্ভরতা এবং দৃঢ় আত্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি আয়ত্ত করার একমাত্র উপায় হল ধ্যান। চারপাশের পরিবেশ যতটা সম্ভব নীরব রাখার চেষ্টা করুন। ছেলেদের মেঝেতে সোজা হয়ে আসন করে বসতে বলুন। বুক, ঘাড় ও মাথা একরেখায় সোজা করে রাখতে হবে।

এবার শান্ত স্বরে এই নির্দেশগুলি দিন।

ধাপ-১

''ধীরে ধীরে ১০ বার লম্বা শ্বাস ভিতরে নাও ও লম্বা শ্বাস ছাড়।" (তাদেরকে স্পষ্টভাবে বলবেন শ্বাস বন্ধ করে না রাখতে। স্বাভাবিকভাবে ও ছন্দে নিঃশ্বাস নিতে ও ছাড়তে হবে)

ধাপ-২

ওঁকার উচ্চারণ কর, ১০ বার। (ছেলেদের ওঁকার ধ্বনি উচ্চারণে নেতৃত্ব দিন)

ধাপ-৩

''হৃদয়ের মাঝখানে একটি পদ্মফুল কল্পনা কর। পদ্মফুলটি থেকে সোনালী আলোর ধারা বেরোচ্ছে ও ফুলের চারিদিকে সোনালী ঢেউ ঘিরে আছে। তোমাকে ঐ সোনালী আলো ঢেকে ফেলেছে।''

ধাপ-৪

''মনে কর তোমার ঈশ্বর পদ্মফুলের উপর বসে তোমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। তাঁর পায়ে প্রণাম কর। তাঁর পা দুটি ধরে থাক। তাঁর কাছে শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি, নম্রতা ও পবিত্রতার জন্য প্রার্থনা জানাও।''

এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করে ধ্যানপর্বটি শেষ করুন—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণ মুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

৬.৯.৩ নৈতিক ব্রত গ্রহণ

ছেলেদেরকে কিছু নৈতিক ব্রত গ্রহণ করান যাতে তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি আকর্ষণ জন্মায়। শান্ত, পবিত্র পরিবেশে এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করুন। ছেলেরা যেন সনাতন ঐতিহ্যের সাথে মানানসই পোষাক পরে আসে। রামকৃষ্ণ সংঘের স্কুলে নবাগত ছাত্রদের 'বিদ্যার্থী হোমের' মাধ্যমে নীচের ব্রতগুলি নেওয়ানো হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটির বর্ণনা প্রথমে সংস্কৃতে, পরে বাংলায় দেওয়া হল ঃ

বিদ্যার্থিহোমবিধিঃ

রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত প্রায় সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নবাগত ছাত্রগণ বিদ্যার্থিজীবনের আদর্শদ্যোতক নিম্নোক্ত বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পবিত্র হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া থাকে।

যথাবিধি অগ্নিসংস্থাপনাদিকৃত্যং সমাপ্য বিদ্যার্থিহোমম্ আরভেত। ততো বিদ্যার্থিনঃ সঙ্কল্পবাক্যং পঠেয়ুঃ—

শ্রীভগবৎপ্রীতিকামোহহং বিদ্যাবুদ্ধিশৌর্য্যবীর্যকামশ্চ, বিদ্যার্থিব্রতমনুষ্ঠাতুং যথাসাধ্যং যতিষ্যে। তদর্থমদ্য পুরোঽবস্থিতে পরমাত্মদেবতানামাগ্নৌ নমঃ পরমাত্মনে স্বাহেতি মন্ত্রেণ সঙ্কল্পান্ উচ্চার্য হোমমহং করিষ্যে।

ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি।
দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু।।

ততো বদ্ধাঞ্জলয়ঃ সন্তঃ প্রপদমন্ত্রং পঠেয়ুঃ

তপশ্চ তেজশ্চ শ্রদ্ধা চ হ্রীশ্চ সত্যঞ্চাক্রোধশ্চ ত্যাগশ্চ
ধৃতিশ্চ ধর্মশ্চ সত্যঞ্চ বাক্ চ মনশ্চাত্মা চ ব্রহ্ম তানি প্রপদ্যে।
তানি মে ভবন্তু ভূর্ভুবঃ স্বরোং মহান্তমাত্মানং প্রপদ্যে।

তত একৈকশঃ সঙ্কল্পপঞ্চকং পাঠিত্বা আহুতিং দদ্যুঃ

১। শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্—ইতি নীতিবাক্যমবধার্য শ্রমক্ষমনীরোগশরীরায় স্বাস্থ্যবিধিপালনপরো ভবিতুমহং যথাসাধ্যং যতিষ্যে।

ওজোঽস্যোজো ময়ি ধেহি। বলমসি বলং ময়ি ধেহি।
পুষ্টিরসি পুষ্টিং ময়ি ধেহি। ঊর্জাস্যূর্জং ময়ি ধেহি।।

পেশয়ো মে লৌহসমা ভবন্তু। স্নায়বো মে অয়াংসীব ভবন্তু। হৃদয়ং মে বজ্রসারং ভবতু।

অসীমতেজোরূপায় শৌর্যবীর্যনিলয়ায় অনন্তশক্তিমূর্তয়ে নমঃ পরমাত্মনে স্বাহা।

২। ছাত্রাণামাধ্যয়নং তপঃ—ইতি স্মৃতিবাক্যমবধার্য প্রতিভাবিকাশার্থমাচারনিরতোঽধ্যয়নপরো ভবিতুমহং যথাসাধ্যং যতিষ্যে।

মেধাং মে ইন্দ্রো দধাতু, মেধাং দেবী সরস্বতী।

মেধাং মে অশ্বিনাবুভাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ।।

নিঃশেষতমোঘ্নায় নিখিলবিদ্যামূর্তয়ে সর্বসিদ্ধিপ্রদাত্রে নমঃ পরমাত্মনে স্বাহা।

৩। সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ—ইতি শ্রুতিবাক্যমবধার্য কায়েন মনসা বাচা সত্যপরায়ণো ভবিতুমহং যথাসাধ্যং যতিষ্যে।

অসতো মা সদ্‌গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।।

সত্যাত্মকায় সত্যধর্মাশ্রয়ায় নিখিলানৃতমর্দিনে নমঃ পরমাত্মনে স্বাহা।

৪। স্বার্থো যস্য পরার্থ এব স পুমানেকঃ সতামগ্রণীঃ—ইতি মনীষিবাক্যমবধার্য নীচতাক্রূরতাদাম্ভিকতাদি মলিনস্বার্থসন্ততীর্বিহায় উদারচেতা বিনয়ী শ্রদ্ধাবান্ দেশভক্তো নরনারায়ণসেবানিষ্ঠো ভবিতুমহং যথাসাধ্যং যতিষ্যে।

শ্রূয়তাং ধর্মসর্বস্বং শ্রুত্বা চাপ্যবধার্যতাম্।
আত্মানং প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ।।

মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি।

চিত্তকলুষহরায় করুণাঘনমূর্তয়ে প্রেমমাধুর্যদায়িনে নমঃ পরমাত্মনে স্বাহা।

৫। সুপরিচালিতসংহতিশক্তিরেব সমাজকল্যাণনিদানম্।

অতঃ ঐক্য প্রতিষ্ঠামুলকং সংহতিশক্তিজাগরণাত্মকং সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্—ইতি শ্রুত্যাদেশমবধার্য সদুপায়পরঃ সন্নহম্ এতদ্‌বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানগোষ্ঠীভুক্তৈঃ সর্বৈরৈক্যবদ্ধো ভবিতুং যথাসাধ্যং যতিষ্যে।

বিশ্বরূপাত্মকায় অখণ্ডৈকতত্ত্বায় সর্বলোকাশ্রয়ায় নমঃ পরমাত্মনে স্বাহা।

তত এভির্মন্ত্রৈর্জুহুয়ুঃ

সঙ্কল্পেষু এষু পরমাত্মদেবতা মে সহায়ো ভবতু স্বাহা।

স মে শুভায় ভবতু স্বাহা। ভবতু শুভায় ভবতু শিবায় ভবতু ক্ষেমায়

পরমাত্মদেবতা স্বাহা।

ওঁ বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।
যদ্ ভদ্রং তন্ম আসুব স্বাহা।
ততঃ পূর্ণাহুতিঃ।

বঙ্গানুবাদ

অগ্নিস্থাপনাদি যথাবিধি সম্পন্ন করিয়া বিদ্যার্থিব্রত হোম আরম্ভ করিবে। অতঃপর সংকল্পবাক্য পাঠ করিবে—শ্রীভগবানের প্রীতি কামনা করিয়া, বিদ্যা-বুদ্ধি, শৌর্য্য ও বীর্য্য কামনা করিয়া বিদ্যার্থিব্রত অনুষ্ঠান করিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আজ এই উদ্দেশ্যে সম্মুখস্থ পরমাত্মদেবতা নামক অগ্নিতে 'নমঃ পরমাত্মনে স্বাহা' এই মন্ত্রে আমি সংকল্প বাক্যসকল উচ্চারণ করিয়া হোম করিব।

জাগ্রত ব্যক্তির যে মন দূরে গমন করে, যে মন আত্মাতে অবস্থান করে, নিদ্রিত ব্যক্তির যে মন একই প্রকারে নিকটে আসে, যে মন ক্ষণমাত্রে বহুদূরগামী এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের পরিচালক, সেই আমার মন শুভসংকল্পযুক্ত হউক।

অনন্তর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রপদমন্ত্র পাঠ কবিবে—তপ, তেজ, শ্রদ্ধা, লজ্জা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, ধৈর্য, ধর্ম, সত্য (দৃঢ়তা), বাক্য, মন, আত্মা ও ব্রহ্ম—এই সকলকে আমি আশ্রয় করি। এই সমস্ত আমাতে বিরাজ করুক। পৃথিবীলোক, অন্তরিক্ষলোক, স্বর্গলোক এবং মহান্ আত্মাকে আমি আশ্রয় করি।

অতঃপর একে একে পাঁচটি সংকল্পবাক্য উচ্চারণ করিয়া আহুতি দান করিবে—

১। 'শরীরই ধর্মলাভের প্রথম উপায়'—এই নীতিবাক্য অবলম্বন করিয়া পরিশ্রমের উপযোগী সুস্থ শরীরের জন্য আমি স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মসকল পালন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

তুমি ওজঃ (জীবনীশক্তিস্বরূপ), আমায় ওজস্বী কর। তুমি বল, আমায় বলবান কর। তুমি পুষ্টি, আমায় পুষ্ট কর। তুমি উৎসাহ, আমায় উৎসাহিত কর।

আমার পেশীসকল লৌহসম হউক, স্নায়ুসকল ইস্পাতের ন্যায় হউক। হৃদয় বজ্রের ন্যায় দৃঢ় হউক।

অসীম তেজস্বরূপ, শৌর্যবীর্যের আধার, অনন্তশক্তিরূপী পরমাত্মাকে প্রণামপূর্বক আমি আহুতি দান করি।

২। 'অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা'—এই স্মৃতিবাক্য অনুসরণ করিয়া প্রতিভাবিকাশের নিমিত্ত আমি অধ্যয়নপরায়ণ হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

ইন্দ্র আমাকে মেধা দান করুন, দেবী সরস্বতী আমাকে মেধাদান করুন, পদ্মমালাধারী অশ্বিনীকুমারদ্বয় আমাকে মেধাদান করুন।

সর্ব-অজ্ঞাননাশক, সকলবিদ্যাস্বরূপ, সর্বসিদ্ধিপ্রদাতা পরমাত্মাকে প্রণামপূর্বক আমি আহুতি দান করি।

৩। 'সত্যই জয়লাভ করে, মিথ্যা নহে। দেবত্বের পথ সত্যের দ্বারা প্রসারিত'—এই বেদবাক্য অবধারণ করিয়া শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা আমি সত্যপরায়ণ হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

আমাকে অসৎ হইতে সৎ-এ, অজ্ঞান হইতে জ্ঞানে এবং মৃত্যু হইতে অমৃতত্বে লইয়া যাও।

সত্যস্বরূপ, সত্যধর্মের আশ্রয়, সর্বমিথ্যানাশক পরামাত্মাকে প্রণামপূর্বক আমি আহুতি দান করি।

৪। 'পরার্থই যাঁহার স্বার্থ, সজ্জনদের মধ্যে তিনিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ পুরুষ'—এই মনীষিবাক্য অবধারণ করিয়া নীচতা, নিষ্ঠুরতা, দাম্ভিকতাদি

হীন স্বার্থসমূহ ত্যাগ করিয়া উদারহৃদয়, বিনয়ী, শ্রদ্ধাবান, প্রেমিক এবং নরনারায়ণের সেবাপরায়ণ হইতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

ধর্মের সার কথা শ্রবণ কর, শুনিয়া উহা অবধারণ কর। যাহা নিজের পক্ষে প্রতিকূল, তাহা অপরের নিমিত্ত অনুষ্ঠান করিও না।

মাতাকে দেবতাজ্ঞান কর, পিতাকে দেবতাজ্ঞান কর, আচার্যকে দেবতাজ্ঞান কর, অতিথিকে দেবতাজ্ঞান কর। অনিন্দিত কর্মসকল অনুষ্ঠান কর, অন্যগুলি নহে।

চিত্তের মালিন্যনাশক করুণাঘনবিগ্রহ, প্রেম-মাধুর্যদাতা পরমাত্মাকে প্রণামপূর্বক আমি আহুতি দান করি।

৫। 'সুপরিচালিত সংঘশক্তিই সমাজ-কলাণের আদি কারণ। অতএব, তোমরা সম্মিলিত হও, একবিধ বাক্য প্রয়োগ কর, তোমাদরে মনসমূহ সমানরূপে একরূপ অর্থ জ্ঞাত হউক'—এই ঐক্যবিধায়ক এবং সঙঘশক্তির উদ্বোধক শ্রুতিবাক্যকে আমি আশ্রয় করিব এবং সদুপায়পরায়ণ হইয়া এই বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের গোষ্ঠীভুক্ত সকলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

বিশ্বরূপাত্মক, এক অখণ্ডস্বরূপ, সর্বলোকের আশ্রয় পরমাত্মাকে প্রণামপূর্বক আমি আহুতি দান করি।

অনন্তর এই মন্ত্রগুলির দ্বারা আহুতি দান করিবে—এই সংকল্পগুলিতে পরমাত্মদেবতা আমার সহায় হউন—স্বাহা। তিনি আমার মঙ্গলের নিমিত্ত হউন—স্বাহা। পরমাত্মদেবতা আমার শুভের নিমিত্ত হউন, মঙ্গলের নিমিত্ত হউন, কল্যাণের নিমিত্ত হউন—স্বাহা।

হে সবিতা, আমার সমস্ত পাপ বিদূরিত কর, যাহা কল্যাণপ্রদ তাহা আমাকে দান কর—স্বাহা। পরিশেষে পূর্ণাহুতি।

ঘ আরো কিছু পরামর্শ

৬.১০ বিশেষ পড়ানোর ব্যবস্থা

লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের জন্য বিশেষ কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা করুন। উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের উৎসাহিত করুন নীচু ক্লাসের ছাত্রদের পড়াবার জন্য। যেন তারা অন্তত পাঁচ-ছয় ক্লাস উপরের হয়। তাদের সামান্য কিছু পারিশ্রমিকেরও ব্যবস্থা করুন। এর ফলে তাদের মনে একটি মহৎ কাজ করার তৃপ্তি আসবে ও অর্থোপার্জনের জন্য গর্বও হবে। বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের আহ্বান করে খারাপ ফল করা ছাত্রদের ভাল ফল করানোর দুরুহ কাজটির দায়িত্ব নিতে উৎসাহিত করুন। ছেলেদের অগ্রগতির সাথে সাথে এই সকল শিক্ষকদেরও পারিশ্রমিক দিতে হবে।

৬.১০.১ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ

তরুণ খেলোয়াড়, কৃতী ছাত্র, সাংস্কৃতিক শিল্পী, অধ্যাপক সমাজের এইসকল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়মিত আমন্ত্রণ করুন ছেলেদের সাথে নানারকম আলোচনা করার জন্য।

৬.১০.২ ছেলেদের দ্বারা কায়িক পরিশ্রম

ছেলেদের বিভিন্ন কায়িক পরিশ্রমের কাজে লাগান যেমন—বাগান করা, কেন্দ্র পরিষ্কার করা, উৎসবের সময় স্থানীয় মন্দিরে শ্রমদান, অন্ধদের প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করা, বৃদ্ধাশ্রমের বয়স্কদের জন্য উপহার সংগ্রহ করা ইত্যাদি।

৬.১০.৩ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা

বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাটক, গান, নাচ ইত্যাদির ব্যবস্থা করুন। শহরে কোন ভাল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হলে ছেলেদের নিয়ে তা শুনতে যান। প্রেরণাদায়ক ডকুমেন্টারি বা বাচ্চাদের সিনেমা দেখানোর ব্যবস্থা করুন। সব ধর্মের উৎসব ও সব ধর্মের সাধু সন্তদের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করুন।

৬.১০.৪ সংবাদ পত্রিকা (News Letter) বার করুন

প্রতি তিন মাস/ছয় মাসে অথবা বছরে একবার সংঘের সব কাজকর্মের বিবরণী দিয়ে একটি পত্রিকা প্রকাশ করুন যেটাতে ছেলেরাই লিখবে এবং যার মধ্যে দিয়ে তাদের সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ ঘটবে। এই পত্রিকা কম্প্যুটারে ছাপিয়ে বা ফোটো কপি করে বিতরণ করুন।

৬.১১ ব্যক্তিত্ব বিকাশ

১০ম ক্লাস পাসের পর বালক সংঘের ছেলেরা নিজেদেরকে আর বালক বলে পরিচয় দিতে চায় না। কারণ তারা এখন যুবক। তাদের জন্য বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করুন। যদি কেউ সংঘের সাথে জড়িত থাকতে চায় তবে তাদের বালক সংঘ পরিচালনার কাজে নিয়োগ করুন। সম্ভব হলে তাদের জন্য যুবক সংঘ তৈরী করুন। মাসে একদিন তাদের জন্য ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত সভার আয়োজন করুন।

ঙ ছেলেদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সভা

প্রস্তুতি ঃ

তিনজন মনোগ্রাহী বক্তাকে নীচের বিষয়গুলির সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

ক) উপনিষদ্, ভগবদ্গীতা, বাইবেল, কোরাণ, গুরু গ্রন্থসাহেব ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের বাণী।

খ) সাধুসন্ত, বিজ্ঞানী, দেশকর্মী, সমাজসেবীদের জীবনী ও বাণী।

গ) মানুষের ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি—যেমন পঞ্চকোষের তত্ত্ব ও এগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ।

ঘ) মনসংযোগের প্রয়োজনীয়তা ও তার পদ্ধতি।

ঙ) ছাত্রজীবনে ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ব

চ) নিরুদ্বিগ্ন মনে পরীক্ষার প্রস্তুতি।

সভায় অংশগ্রহণকারীদের থেকে সামান্য চাঁদা সংগ্রহ করুন ও সভার

ব্যয়ভার বহন করার জন্য কোন সংস্থাকে পৃষ্ঠপোষক করুন। একটি মঞ্চে দেব-দেবী ও সব ধর্মের সাধু-সন্তদের ছবি সাজান।

অনুষ্ঠান সূচী

সকাল ৮ঃ৩০-৯ঃ০০	সভায় উপস্থিতি
সকাল ৯ঃ০০-৯ঃ৩০	প্রার্থনা ও ধ্যান
সকাল ৯ঃ৩০-১০ঃ০০	ভূমিকা
সকাল ১০ঃ০০-১১ঃ০০	১নং বক্তৃতা
সকাল ১১ঃ০০-১১ঃ১৫	বক্তৃতার উপরে প্রশ্নোত্তর
সকাল ১১ঃ১৫-১১ঃ৩০	চা-পান
সকাল ১১ঃ৩০-দুপুর ১২ঃ৩০	২নং বক্তৃতা
দুপুর ১২ঃ৩০-১২ঃ৪৫	প্রশ্নোত্তর
দুপুর ১২ঃ৪৫-১ঃ১৫	অষ্টোত্তর নামাবলী ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে কীর্ত্তন
দুপুর ১ঃ১৫-২ঃ১৫	হাল্কা খাওয়া
দুপুর ২ঃ১৫-বিকেল ৩ঃ১৫	৩নং বক্তৃতা
বিকেল ৩ঃ১৫-৩ঃ৩০	প্রশ্নোত্তর
বিকেল ৩ঃ৩০-৪ঃ৪০	সংঘ সদস্য ও বিশেষজ্ঞ দ্বারা যোগাসন প্রদর্শন, ধর্মীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
বিকেল ৪ঃ০০-৫ঃ০০	খেলাধূলা
বিকেল ৫ঃ০০	সমাপ্তি

৬.১২ শিক্ষকদের ও পিতা-মাতাদের জন্য কর্মশালা (workshop)

এলাকার শিক্ষক শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের মধ্যে মতামত আদান প্রদানের মাধ্যম হিসাবে বালক সংঘকে ব্যবহার করা যেতে পারে। একটি পুরো দিন বা অর্ধ্ব দিনের জন্য একটি কর্মশালার আয়োজন করা যেতে পারে।

প্রস্তুতি ঃ বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ করুন, কর্মশালার অনুষ্ঠানসূচী তৈরী করুন।

অনুষ্ঠান সূচী

- বৈদিক স্তুতিগান
- মহান ব্যক্তিদের বাণীপাঠ
- পরিচালকের অভ্যর্থনামূলক বক্তৃতা
- বিশেষজ্ঞের মূল বক্তৃতা
- মূল্যবোধ প্রয়োগের অসুবিধা সম্পর্কে শিক্ষক ও বাবা মায়েদের বক্তব্য পেশ ও আলোচনা।
- আলোচনার সারাংশকরণ
- প্রশ্নোত্তর
- উপসংহার ও কর্মপ্রণালী
- কর্মশালার কার্যবিবরণী ছাপিয়ে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ।

যেসব বিষয় নিয়ে কর্মশালায় আলোচনা করা যেতে পারে—

- মূল্যবোধ শিক্ষার ধারণা ও উদ্দেশ্য
- আমাদের সন্তানরা বড় হয়ে কি হোক আমরা চাই?
- ছাত্রদের জীবনে উন্নতির পথ ও মূল্যবোধ শিক্ষা
- আলোকপ্রাপ্ত গৃহস্থ নাগরিক
- মিডিয়ার বাধা সত্ত্বেও মূল্যবোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করা
- আধুনিক সমাজে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রয়োজনীয়তা
- সমাজ পুনর্গঠন ও পরিবর্তনে শিক্ষিত মানুষের ভূমিকা
- বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে উপলব্ধি
- আধ্যাত্মিক জীবন গড়ার জন্য কি আবশ্যক?
- সেবামূলক জীবন
- পরিবেশ ও মূল্যবোধ
- ব্যক্তিগত, সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধ

- মহাকাব্যের মূল্যবোধ
- হিন্দু/মুসলিম/খ্রীস্টান/শিখ/জৈন/বৌদ্ধধর্মে মূল্যবোধ
- মানুষের উৎকর্ষ সম্পর্কে ভগবদ্‌গীতা
- মানবাধিকার
- নৈতিক উন্নতিতে বাবা-মা, শিক্ষক ও সমাজের দায়িত্ব
- মূল্যবোধের উৎস
- স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, শ্রী অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে শিক্ষার আদর্শ
- গল্পের মধ্য দিয়ে মূল্যবোধের শিক্ষা
- মনের সংযমের প্রয়োজনীয়তা

আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ স্কুল/কলেজ শিক্ষক/শিক্ষিকা আছেন। যদি তাঁদের এই বিপুল শক্তি চরিত্র গড়ার আন্দোলনে ব্যবহৃত হয় তাহলে আমরা কি না করতে পারি?

অধ্যায় ৭ একজন প্রেরণাদাত্রী শিক্ষিকা

শ্রীমতী মেরি নোবল যখন প্রথমবার সন্তান সম্ভবা হন, তখন নিরাপদে সন্তান প্রসব করা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় ছিলেন। তাই তিনি সবসময়ে প্রার্থনা করতেন ও তাঁর এই সন্তানকে ঈশ্বরের সেবায় উৎসর্গ করার শপথ নেন। অবশেষে ১৮৬৭ সালের ২৮শে অক্টোবর আয়ার্ল্যান্ডে মার্গারেট এলিজাবেথ নোবলের জন্ম হয়। তিনি যত বড় হয়ে উঠতে থাকেন তাঁর উপরে তাঁর জন্মের আগে তাঁর মার মানসিক অবস্থার প্রভাব দেখা যেতে থাকে। এমনকি বালিকা বয়সেও মার্গারেট খুব ধার্মিক ছিলেন এবং পরবর্তীকালে সত্যের পথে অটল হয়ে থাকা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে।

সতেরো বছর বয়সে মার্গারেট শিক্ষিকার জীবন আরম্ভ করেন। তাঁর মনের মত এই পেশাতে তিনি মন-প্রাণ ঢেলে দেন ও প্রচুর উৎসাহ নিয়ে এই বিষয়ে পড়াশুনা শুরু করেন। পেস্টালজি (Pestalozzi) ও ফ্রোয়েবেল (Froebel) দ্বারা প্রবর্তিত নবধারার শিক্ষাদর্শন তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। খুব শীঘ্রই তিনি লণ্ডনের বোদ্ধা মানুষদের সাথে পরিচিত হয়ে ওঠেন ও শিক্ষিত সমাজে তাঁর বক্তৃতা ও লেখা প্রশংসিত হতে থাকে। ১৮৯২ সালে তিনি শিশুদের জন্য নিজের একটি স্কুল খোলেন যেখানে প্রথাগত শিক্ষার কোন সীমাবদ্ধতা ছিল না। এইভাবে তিনি একজন সফল শিক্ষিকা হয়ে ওঠেন।

শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহ ছাড়াও মার্গারেটের সময় ও শক্তি ব্যয়িত হত আধ্যাত্মিকতা ও সত্যের সন্ধানে। তিনি তাঁর জন্মগত খ্রীস্টান ধর্মের মতবাদে তৃপ্তি পেতেন না ও তাঁর মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল এক তীব্র আধ্যাত্মিক আকুতি। এমতাবস্থায়, ১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দের ইংলণ্ডের

প্রথম সফরের সময় তাঁর সংস্পর্শে এসে মার্গারেটের এই আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের শেষ হয়। তিনি স্বামীজীকে গুরু হিসাবে বরণ করেন ও ভারতীয় নারীদের উন্নতির জন্য কাজ করতে ১৮৯৮ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতবর্ষে আসেন। মার্গারেটকে শিষ্যা হিসাবে গ্রহণ করে তাঁকে ব্রহ্মচারিণীর ব্রতে দীক্ষা দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর নাম দেন 'নিবেদিতা'—যার অর্থ ''সেবার জন্য (ভারতবর্ষে) উৎসর্গীকৃত।''

ভারতবর্ষে সিস্টার নিবেদিতার কাজ ছিল বাস্তবিক বহুমুখী—যার মধ্যে শিক্ষা ছাড়াও বিজ্ঞান, কলা, সামাজিক কল্যাণ ও বিপ্লবী রাজনীতিও ছিল। এই সর্বক্ষেত্রেই তিনি তাঁর উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের এবং সূক্ষ অন্তর্দৃষ্টির গভীর ছাপ রেখেছেন।

তবে গুরুর নির্দেশমত তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার। ১৮৯৮ সালের ১৩ই নভেম্বর বাগবাজার এলাকার কয়েকজন বিবাহিত ও বিধবা মেয়েদের নিয়ে তিনি নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় খোলেন। কিন্তু স্কুলের আর্থিক সঙ্কট দূর করার জন্য সিস্টার নিবেদিতাকে শীঘ্রই ইংলণ্ড ও আমেরিকা যেতে হয়। তাঁর স্কুলে কিন্ডার গার্টেন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হত এই পদ্ধতি অনুযায়ী যে, ''সমস্ত জ্ঞানই বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে ও শিশুর কাছে কাজ যেন খেলার সমতুল হয়ে ওঠে।'' ক্রমশঃ, নিয়মিত পড়ার বিষয় ছাড়াও ছাত্রীদের ছবি আঁকা, মাটির মূর্তি গড়া, মাদুর বোনা, কাগজ কাটা ও নানা খেলা শেখানো শুরু হয়। পরে, এই বালিকা বিদ্যালয়ে নারী বিভাগ আরম্ভ করা হয়, যেখানে বয়স্কা মেয়েদের শিক্ষিকা হওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। নিবেদিতা প্রতিটি ছাত্রীর প্রতি গভীর মনোযোগ দিতেন ও তাদের ব্যক্তিগত অগ্রগতির বিবরণী রাখতেন, যার কিছু নীচে দেওয়া হল—

বিদ্যুৎমালা বোস

জাতি কায়স্থ, ৬০ বারের মধ্যে ৪৫ বার উপস্থিত। আমার দেখা দৃঢ় চরিত্রগুলির মধ্যে একটি। তার সাহস ও দৃঢ় সঙ্কল্প বিস্ময়কর। তার রুচি

খুব সুন্দর। তার সাথে আলাদা করে একদিন কথা না বলা পর্যন্ত সে খুব অবাধ্য ছিল ও গণ্ডগোল করত। তারপর থেকে অবশ্য তার দিকে একবার তাকিয়ে হাসলেই যথেষ্ট হত। তার কাছ থেকে মুখোরোচক কিছু উপহার সবসময়েই আসত। তার ভিতরে একটা আগুন আছে ও কিছু করার জন্য যথেষ্ট ইচ্ছাশক্তি আছে...। বিশেষ করে তার সেলাই এর কাজ খুব ভাল।

জ্ঞানদাবালা

জাতি কৈবর্ত, ২২ বার উপস্থিত ছিল। সে খুব দয়ালু হৃদয়ের এবং তার ঘরের কাজ করার বাতিক আছে। সে কোনসময়েই পড়াশুনা করতে ভালোবাসে না ও তাকে বই পড়তে শেখানো খুব কষ্টকর। কিন্তু সে ভীষণ খুশী হয় যদি তাকে স্কুলঘর পরিষ্কার করতে বা বেটকে সাহায্য করতে বলা হয়। পরের দিকে প্লেগ মহামারীর সময় আমি যখন কাজ পরিদর্শনের জন্য যেতাম তখন সে আমার ছায়ার মত আমার সাথে ঘুরত। (*সিস্টার নিবেদিতা অব রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, ১ঃ৬১)*

তিনি সবসময়ে চেষ্টা করতেন যাতে তাঁর স্কুলের মেয়েদের চরিত্রগঠনের জন্য তাদের মনের মধ্যে 'কিছু উন্নতভাব ও প্রেরণা' ঢুকিয়ে দিতে। তিনি ঐ কাজটি স্কুলে পড়ানোর সময় ছাড়াও ছাত্রীদের চিড়িয়াখানা, যাদুঘর বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার সময়ও করতেন। তাঁর ছাত্রীদের হাতের কাজের জন্য তিনি গর্ববোধ করতেন এবং ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের স্বদেশী প্রদর্শনী সহ অন্যান্য নানা প্রদর্শনীতে তাদের হাতের কাজ দেখানোর জন্য পাঠাতেন। একটি পবিত্র ও সরল জীবনযাপন করে তিনি তাঁর ছাত্রীদের কাছে আত্মত্যাগের এক আদর্শ হয়েছিলেন।

প্রফুল্লমুখী নামে তাঁর এক বাল্য-বিধবা ছাত্রীকে হিন্দুধর্মের নিয়ম অনুযায়ী একাদশীর দিন উপোস করতে হত। নিবেদিতা ঐদিন তাকে নিমন্ত্রণ করে ফল, মিষ্টি খাওয়াতেন। কিন্তু একবার একাদশীর দিন স্কুলে নানা কাজের ব্যস্ততার মধ্যে কাটিয়ে দিনের শেষে তিনি ডঃ জগদীশ চন্দ্র বোসের

বাড়ীতে রাত্রে খাওয়ার নিমন্ত্রণে যান। সেখানে গিয়ে তাঁর হঠাৎ মনে পড়ে যে সেদিন প্রফুল্লমুখীকে তিনি কিছু খেতে দেন নি। অস্থির হয়ে সাথে সাথে তিনি বাড়ীতে ছুটে আসেন ও মেয়েটিকে ডাকিয়ে আনেন। তারপর তাকে খাওয়াতে খাওয়াতে তার কাছে বারবার ক্ষমা চেয়ে বলতে থাকেন, ''বাছা আমার, আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। এ আমার কত-বড় অন্যায় যে তোমাকে কোন কিছু খেতে না দিয়ে আমি নিজে খেয়ে নিয়েছি, আমি এত বিবেচনাহীন।''

ছাত্র-ছাত্রীদের মন, ইচ্ছা ও অন্তরের বিকাশ ঘটায় এমন একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাপদ্ধতির কথা বলে তিনি লিখেছিলেন—''যদি আমাদের অনুভূতি ও পছন্দকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি তাহলে আমাদের লোকেরা শিক্ষিত হয়নি। সে খালি কয়েকটা বুদ্ধির কায়দা জেনে দিয়ে কাজ করতে শিখেছে। এই কায়দাগুলি লাগিয়ে সে রুটির রোজগার করতে পারবে। কিন্তু এতে তার অন্তরের জাগরণ হবে না বা জীবন দিতে পারবে না। সে মোটেই মানুষ নয়, সে আসলে একটি চালাক বানর।

এর জন্য একটি মাত্র পথই আছে। তা হল ছোটবেলায় শিক্ষার সময় সারাক্ষণ মনে রাখা যে অনুভূতির নিয়ন্ত্রণের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই। মহান অনুভূতি এবং সৎ ও উচ্চ মনোভাব নিয়ে বিচার করতে শেখা—ঐগুলি শিক্ষাপদ্ধতির যে কোন বিষয়ের চেয়ে হাজারগুণ বেশী গুরুত্বপূর্ণ। যে শিশুর মধ্যে এই ক্ষমতা সত্যিই এসেছে সে যে কোন পরিস্থিতিতে শ্রেষ্ঠ কাজটিই করবে।'' *(কমপ্লীট ওয়ার্কস অব সিস্টার নিবেদিতা, চতুর্থ খণ্ড; পৃষ্ঠা ঃ ৩৪৪ এবং ৩৪৫)।* শিশুর বিকাশ কেবল তার নিজের জন্য নয় বরং জন-দেশ-ধর্মের জন্য। শিশুর স্কুলে যাওয়ার সময় তার স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার যে ''আমি যেন মানুষ হতে শিখি ও অন্যকে সাহায্য করতে শিখি।'' জাতীয়তাবোধকে নিবেদিতা ''অন্যের জন্য অনুভব'', 'সংগঠিত নিঃস্বার্থপরতা' বলে বর্ণনা করেছেন এবং বাবা-মা সন্তানদের মধ্যে কিভাবে এই বোধ জাগাতে পারেন তার নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

''শিশুর মনে দেশগঠনের সবচেয়ে ভাল প্রস্তুতি হয় যদি সে দেখে যে বড়রা সবসময় তাদের নিজেদের বদলে সমাজের বৃহত্তর কল্যানের জন্য ব্যগ্র। যে পরিবার গ্রাম, রাস্তা বা শহরের জন্য স্বেচ্ছায় নিজেদের স্বার্থত্যাগ করতে পারে; যে পরিবার নিজেদের আরাম বা নিরাপত্তার জন্য সরকারী কর্মীদের অসাধুতাকে প্রশ্রয় দেয় না; যে বাবা অন্যের সম্মান ও ন্যায়ের জন্য যে কোন বাধার সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে; তারাই হল শিশুর জন্য দেশগঠনের শ্রেষ্ঠ পাঠ।'' (কমপ্লীট ওয়ার্কস অব সিস্টার নিবেদিতা, *চতুর্থ খণ্ড; পৃষ্ঠা ঃ ৩৪৭ এবং ৩৪৮*)

কিছু কিছু দেশে যুবকদের পড়াশুনা শেষ হওয়ার পর কয়েক বছরের জন্য বাধ্যতামূলক সমাজ সেবার প্রথা উল্লেখ করে, সিস্টার নিবেদিতা, ভারতবর্ষের জন্য এই ধরণের প্রথা চালু করার কথা বলতেন। কিন্তু এই যুবাবাহিনীকে সেনাবাহিনীতে কাজ করার বদলে শিক্ষকবাহিনী হিসাবে প্রত্যেক নগরে, শহরে, গ্রামে সাধারণ মানুষের সেবার কাজে লাগাতে হবে। যদি এই শিক্ষাবাহিনীকে একবার চালু করা যায় তাহলে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই সারা দেশ সাক্ষর হয়ে উঠবে। এই গণ প্রাথমিক শিক্ষার সবচেয়ে ভাল উপায় হল বাবা-মা ও শিক্ষকদের সমর্থন সহ ছাত্রদের এই কাজে স্বেচ্ছায় যোগ দেওয়া।

বাস্তবিক, সিস্টার নিবেদিতা আত্মত্যাগ, গভীর আধ্যাত্মিকতা, চরিত্রশক্তির ও ভারতের জন্য সর্বগ্রাসী ভালোবাসার এক জ্বলন্ত উদাহরণ ছিলেন।

অধ্যায় ৮

এক পিতার চিঠি

কোনো পিতা-মাতা তাদের সন্তানের শিক্ষকের কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করবেন? নীচে একজন পিতা তার সন্তানের শিক্ষককে লেখা এক চিঠিতে খুব সুন্দরভাবে এটি ফুটিয়ে তুলেছেন ঃ

আমি জানি ওকে শিখতে হবে যে সব মানুষ ন্যায়পরায়ণ হয় না ও সব মানুষ সত্যবাদী হয় না। কিন্তু ওকে এও শেখাবেন যে একজন বদমাস হলে, অন্য আরেকজন বীরপুরুষ হয়, প্রত্যেক স্বার্থপর রাজনীতিকের পাশাপাশি এমন একজন নেতা আছেন যিনি নিজেকে অন্যের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছেন। ওকে শেখাবেন যে একজন শত্রু হলে, অন্য আরেকজন বন্ধু পাওয়া যায়।

আমি জানি এর জন্য সময়ের দরকার। কিন্তু যদি পারেন ওকে শেখাবেন যে কোন চেষ্টা ছাড়া পাওয়া পাঁচ টাকার চেয়ে খেটে রোজগার করা এক টাকার অনেক বেশী দাম। ওকে হার স্বীকার করতে ও জয়ের আনন্দ উপভোগ করতে শেখাবেন। যদি পারেন ওকে পরশ্রীকাতরতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখুন ও শান্ত হাসির গোপন কথাটি শেখান।

ওকে তাড়াতাড়ি শিখতে দিন যে গুন্ডাদের শায়েস্তা করা সোজা। ওর মনে বই সম্পর্কে কৌতুহল জাগাবেন। কিন্তু ওকে কিছুটা নিজের জন্যও সময় দেবেন যাতে ও আকাশের পাখীদের, রোদের মধ্যে মৌমাছিদের নাচ, সবুজ পাহাড়ের গায়ে ফুল ফোটা দেখে তার রহস্য নিয়ে ভাববার অবকাশ পায়। স্কুলে ওকে শেখাবেন যে নকল করে পাস করার চেয়ে ফেল করা অনেক সম্মানজনক।

ওকে শেখাবেন সবাই ভুল বললেও সে যেন নিজের মত ও ধারণার

উপর বিশ্বাস না হারায়। ওকে ভদ্রের সাথে ভদ্র ব্যবহার করতে ও শয়তানের সাথে কঠোর হতে শেখান। ওকে চারিত্রিক শক্তি দেওয়ার চেষ্টা করুন যাতে সে সবাই যে দিকে যাচ্ছে তাদের সাথে বিচার বিবেচনা না করে যেন না যায়। ওকে শেখাবেন সবার কথা মন দিয়ে শুনতে কিন্তু সত্যের আলোয় বিচার করে তার ভিতর থেকে শুধু সৎ বিষয়টুকু নিতে।

ওর মন খারাপ হলে কিভাবে হাসতে হয় শেখান ও কাঁদলে যে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই তাও শেখান। ওকে নিন্দুকদের উপহাস করতে ও চাটুকারদের এড়িয়ে চলতে শেখাবেন। ওকে শেখাবেন যে মস্তিষ্ক ও শক্তিকে সে সবচেয়ে বেশী দাম দেবে তার কাজে লাগাতে কিন্তু হৃদয় ও আত্মা কোন মূল্যেই যেন না দেয়। উচ্ছৃঙ্খল জনতার গর্জনে কান না দিয়ে নিজে যা ঠিক মনে করবে তার জন্য লড়াই করতে ওকে শেখান। ওর সাথে স্নেহভরা ব্যবহার করলেও বেশী আদর দেবেন না কারণ লোহাকে পোড়ালে তবেই ইস্পাত তৈরী হয়। ওকে দরকার হলে অধৈর্য হওয়ার সাহস দেখাতে দিন আবার বীর হওয়ার ধৈর্য্যও যেন দেখাতে পারে। ওকে সবসময় নিজের উপর পূর্ণবিশ্বাস রাখতে শেখান; তবেই ও মানবজাতিকেও সবসময় বিশ্বাস করতে পারবে।

আমি জানি আপনাকে খুব কঠিন কাজের ভার দিলাম, দেখুন কতটা করতে পারেন কারণ ছেলেটি আমার বড় ভালো।